জাহানারার আত্মকাহিনী

জাহানারার সমাধি

প্রারম্ভ পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

মুঘল পরিবারে আত্মজীবনী রচনা পারিবারিক সংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিবেচিত হ'ত। মুঘল বংশ প্রতিষ্ঠাতা তৈমুর লিখেছিলেন--"মালফুজাত-ই-তৈমুরা"—তৈমুরের আত্মকাহিনী। বাবর লিখেছিলেন—"তুজুক-ই-বাবরী"—বাবরের ঘটনাবলি। আকবরের অনুরোধে বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম লিখেছিলেন···"হুমায়ুন-নামা"—হুমায়ুনের কাহিনী; আকবর অবশ্য শৈশবে রীতিমত জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ পান নি, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সে অভাব পূরণ করেছিলেন তাঁর রাজসভায় নবরত্ন প্রতিষ্ঠা করে। জাহাঙ্গীর রচিত "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর"—অপূর্ব্ব আত্মজীবনী। মুঘল যুগে প্রত্যেক রাজসভার রাজ-লেখক বা "ওয়াকিয়া-নবীশ" (Recorder of Events) উপস্থিত থাকতেন। তিনি বাদশাহের মুখনিঃসৃত ক্ষুদ্রতম কথাও লিখে নিতেন। ওয়াকিয়া-নবীশের লেখা পড়লে মুঘল রাজত্বের কত অদ্ভুত ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। মুঘল যুগে ১৫২৬-১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৮৬ বৎসরে বাবর বংশে ২২০০ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাহজাহানের পুত্র দারা শুকোর রচিত সর্-ই-আস্‌বার—উপনিষদের সার-সংগ্রহ, অপরূপ রচনা। তিনি হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির প্রচেষ্টা করেছিলেন। জাহানারা কারাজীবনে তাঁর আত্মকাহিনী লিখেছিলেন। সে কাহিনী সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃবিরোধের ইতিহাস।

১৬৫৭ সাল। সম্রাট শাহজাহান পক্ষাঘাতে পঙ্গু। মমতাজ বহুদিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর চার পুত্র দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ; দুইকন্যা জাহানারা ও রোশন-আরা। দারার বয়স ৪৩,

শুজা ৪১, আওরঙ্গজেব ৩৯, মুরাদ ৩৩। প্রত্যেকেই বয়স্ক, বীর, যোদ্ধা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। শাহ্‌জাহানের প্রিয়পুত্র জ্যেষ্ঠ দারা শুকো, প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা। মাতৃহীনা কন্যা পত্নীহারা পিতা শাহ্‌জাহানকে যত্ন, মমতা, প্রীতি দিয়ে আবেষ্টন করে রেখেছিলেন। জাহানারা ছিলেন মুঘল অন্তঃপুরের মধ্যমণি। রাজকার্য্যেও তিনি সময় সময় সম্রাটকে সাহায্য করেছেন। সম্রাটের "পাঞ্জা" মোহর বহুদিন তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। দারার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল গভীর, কারণ দুইজন আকবরের অনুসৃত হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে ছিল ভ্রাতাভগ্নীর সংস্কারগত বিরোধ। সকলেরই ধারণা ছিল, শাহ্‌জাহানের অভিপ্রায় অনুসারে দারাই সিংহাসনে আরোহণ করবেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে বাঙ্গালা থেকে শুজা, গুজরাট থেকে মুরাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে আওরঙ্গজেব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন।

আওরঙ্গজেব ভগ্নী রোশন-আরার সাহায্যে রাজপরিবারের ও রাজ দরবারের বহু সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মাতুল শায়েস্তা খান, দেওয়ানীর জুমলা, আমীর খলিলুল্লা খান গোপনে আওরঙ্গজেবকে সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দারা যুবরাজ, সম্রাটের নিকট রাজধানীতে বাস করতেন। রাজ-দরবারে দারার শত্রু ছিল বহু, কারণ দারার উদার ধর্মমত প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি।

শুজা বাংলার সুবেদার, সুদক্ষ যোদ্ধা; কিন্তু অলস, অকর্মণ্য সঙ্গীত-বিলাসী, নারীসঙ্গলোভী।

মুরাদ গুজরাটের সুবেদার; বীর, সাহসী; কিন্তু সরল বিশ্বাসী, আত্মম্ভরী, অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী।

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদার; বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, ধূর্ত; তাঁর ইস্‌লামের বিশ্বাস সে যুগে তাঁকে 'জীন্দাপীরে'র আসন দিয়েছিল।

শাহজাদা দারা প্রস্তাব করলেন, নজবৎ খানের সঙ্গে শাহজাদী জাহানারার বিবাহ দিয়ে তিনি তাঁর সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করবেন। কিন্তু জাহানারার আকর্ষণ ছিল বুন্দেলা রাজা ছত্রশালের প্রতি। বুন্দেলা পরিবার কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত মুঘলের অন্যতম সম্মানিত বিশ্বস্ত প্রীতিভাজন সামন্ত পদে অভিষিক্ত ছিল। ছত্রশাল স্বয়ং ছিলেন বীর, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, ভাবপ্রবণ। জাহানারার জীবনের অনেক কাহিনী ছত্রশালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক মুঘল যুগে মুঘল-রাজপুত বিবাহ অসম্ভব ব্যাপার বলে বিবেচিত হ'ত না। ছত্রশাল ও জাহানারার কাহিনী দিল্লী আগ্রার দরবারে অনেকেই জানত।

জাহানারার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল। মুঘল রাজান্তঃপুরে প্রায় শতাধিক বৎসর যাবৎ রাজপুত নারীর অবস্থান হেতু হিন্দুভাবধারা প্রবেশ করেছিল। আকবরের মহিষী ছিলেন বিহারীমলের কন্যা যোধবাই; জাহাঙ্গীরের মহিষী মানসিংহের ভগ্নী মানবাই; শাহজাহানের মাতা ছিলেন মোতিরাজা জয়সিংহের কন্যা জগৎ গোঁসাইনী। জাহানারার মাতা ছিলেন পারস্য দেশীয় মমতাজ-বেগম, নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী! তাঁর রক্তে মুঘল, তুর্ক, পারস্য, রাজপুত রক্তের এক অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। এই সংমিশ্রণ জাহানারার চরিত্রের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং অনেক প্রশ্নের মীমাংসাও করেছিল।

ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহানারা বেশ একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব জাহানারাকে যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে তাঁর পক্ষে সমর্থন করবার জন্য বহু অনুরোধ করেছিলেন। জাহানারা তাঁর পিতার কারাজীবনের সঙ্গিনী, ভ্রাতার ও ভ্রাতৃষ্পুত্রদের নৃশংস মৃত্যুর মূক সাক্ষী। তিনি মুঘল যুগের বহু অত্যাচার অনাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

আগ্রার দুর্গে দারার ছিন্নমুণ্ড আওরঙ্গজেব তাঁর পিতার নিকট প্রেরণ করেছিলেন, কারণ শাহজাহানকে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে

নিঃসন্দেহ করতে চেয়েছিলেন। কারণ শাহজাহান হয়ত ভবিষ্যতে দারার পক্ষে সিংহাসনের বিষয় চিন্তা করতে পারেন। কি মর্মান্তিক সেই দৃশ্য—পিতা বন্দী, প্রিয়পুত্রের ছিন্নমুণ্ড তাঁর সম্মুখে। জাহানারা দারার ছিন্নমুণ্ড দর্শনে শিহরে উঠলেন। নিজের নিকটই নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। রচিত হল "জাহানারার আত্মকাহিনী"। এই হ'ল জাহানারার আত্মজীবনীর ইতিহাস।

পিতার মৃত্যুর পর জাহানারা ১৪ বৎসর আগ্রা দুর্গে বন্দিনী-জীবন যাপন করেছেন। সেই সময় এই আত্মকাহিনী বিভিন্ন দিনে পুরাতন স্মৃতির বিভিন্ন অংশগুলি সংযোজিত করে লিখেছেন। জীবনের সীমারেখান্তে সে জীবনের অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন, আওরঙ্গজেবকে ক্ষমাও করেছিলেন। আত্মজীবনীর কতক অংশ তিনি নষ্ট করেছিলেন; পরে অবশ্য তিনি মত পরিবর্ত্তন করেছিলেন। এবং বিভিন্ন অংশগুলি একত্র করে জেসমিন প্রাসাদের শিলাতলে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

বহুকাল পরে দুইশত বৎসর পরে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বিদেশিনী অপরিচিতা বান্ধবী আন্দ্রিয়া বুটেনসন আবিষ্কার করলেন সেই খণ্ডিত, অসংলগ্ন জীবনস্মৃতি। নারীর মনোবেদনা প্রাণে প্রাণে বুঝল নারী—হউক না সে সাগরপার-বাসিনী বিদেশিনী, হউক না তাঁদের সময়ের দূরত্ব দুই শত বৎসর; তবুও তারা নারী। বিদেশিনী প্রকাশ করলেন তাঁর নিজের ভাষায় বুকের রক্ত দিয়ে লেখা মুঘল রাজকুমারীর আত্মকাহিনী।

জাহানারার আত্মজীবনী কাশ্মীর থেকে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা বৈশাখ, ১৩৫৭

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

জাহানারার আত্মকাহিনী

প্রথম স্তবক

ওগো মরণ! তুমি মানুষের রূপ পরিগ্রহ করে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার প্রাণহীন আঁখি নিয়ে আমার সম্মুখে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করছ! তোমার শীতল নিঃশ্বাস আমার মুখমণ্ডলকে শীতলতর করে দিচ্ছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমার শেষ আশা বিলীন হয়ে আসছে। ঐ যে দারার ছিন্ন শির ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে! পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছে। তারপর কারাগারে সেই মুণ্ড আমার নিকট এসেছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান, তোমার নাম বাঁশীর সুরে, করতালের কলরোলে একদিন পৃথিবীতে ধ্বনিত হয়েছিল। যে রক্ত-ধারায় তোমার পুণ্যভূমি পরিধৌত হয়েছিল—তা' তোমাকে খণ্ডিত-দেহ করেছে, তোমাকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারে নি। কেন পারে নি বলত? আমার সুকোমল কেশদাম আমি ছিন্ন করে

* এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগ্রা প্রাসাদের জেসমিন প্রাসাদের (সামান বুরুজ) ভগ্নমর্ম্মর শিলাতলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ। খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্রিত করে ন্যূনাধিক পূর্ণাঙ্গ 'আত্মজীবনীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে। সেই কৃতিত্ব বিদেশিনী আন্দ্রিয়া বুটেনশনের। জাহানারা অসহায়া রাজকুমারী—ভ্রাতার মৃত্যু, পিতার কারাজীবন ও মুঘলসন্তানদের নৃশংস মৃত্যুর সাক্ষী জাহানারার করুণকাহিনী মুঘল-যুগের অপূর্ব্ব-সম্পদ। এই কাহিনীতে আছে সৌন্দর্য্য ও বিভীষিকার অপরূপ সমন্বয়, মানবাত্মার শাশ্বত রূপ।

ফেলেছি ; আমার কণ্ঠ থেকে মণিমালা ছিন্ন করে দিলাম—কিন্তু কই উত্তর ত পেলাম না।

আমার নয়নের সম্মুখে অন্ধকার নেমে আসছে, আমি আমার অন্তরকে প্রশ্ন করেছি—আমি অতীতের দিকে চেয়ে দেখেছি। আমি কোন উত্তর পাই নি।

আমি দেখছি সৈন্যের স্রোত একটির পর একটি ঝঞ্ঝার বুকে উর্ম্মিমালার মত ভারতের প্রান্তর পর্ব্বত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ঝঞ্ঝা সমস্ত দেশকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে, দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

তারপর একদিন শান্তি এসেছিল। দেবতার আবাসের মত প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল ভারতের পুণ্যভূমিতে। তারপর আবার ঝঞ্ঝা এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যের অবিশ্রান্ত পদধ্বনি আর অবিরাম রক্তস্রোত :

যমুনা বয়ে চলেছে আগ্রাদুর্গের শিলাতল পরিধৌত করে ; সেই জলস্রোত পরিণত হল রক্তস্রোতে। যুগ যুগ সঞ্চিত রক্তস্রোত বয়ে চলেছে সমুদ্রের পানে—সমুদ্র-জলরাশি রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। রক্তরাগরঞ্জিত উর্ম্মিমালা উর্দ্ধে আকাশে তারার বিরুদ্ধে আস্ফালন করছে। নীল-মেঘপুঞ্জ আমার মাথার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই নীল মেঘ বসুন্ধরা আর জলধারায় সমস্ত লালিমা নিঃশেষ করে নিয়েছে। বর্ষণমুখর মেঘ রক্ত মোক্ষণ করছে।

এখনো এক বৎসর অতীত হয়নি—আমরা আগ্রার দুর্গে বন্দিনী হয়েছি। সে দিন যুবরাজ দারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমি আজও দেখতে পাচ্ছি—এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সুবর্ণ-মণ্ডিত একটি সরীসৃপের মত ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অতিক্রম করে চলেছে দিক্‌চক্রবালের দিকে। আমি সহস্র সহস্র গজ উষ্ট্র অশ্বের পদধ্বনি আজও শুনতে পাচ্ছি। রাজপুতের উজ্জ্বল বর্ষা-

গাহিনী পরিবৃত হয়ে যুবরাজ দারা তাঁর প্রিয় হস্তী ফতেজঙ্গের(১) উপরে মাসীন—আলোকস্তম্ভের মত সৈন্যরাজির মধ্যস্থলে যুবরাজ দারা শুকো মস্ত মানবের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন।

উঃ! যুবরাজ দারার পরাজয়ের দুঃসংবাদ আগ্রার দুর্গে প্রচারিত ল, আমি আকুল ক্রন্দন করলাম, কেবল ক্রন্দন। সে ক্রন্দন আজও আমার শেষ হয় নি। কি ভীষণ দুর্ভাগ্য আমার ভ্রাতার! আমি তাঁর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি নি। যুবরাজ দারা! তোমার প্রাণে ল অপূর্ব্ব মহিমা। তোমার অন্তরে ধ্বনিত হত সম্রাট আকবরের মিলনের সুর। একই ভগবান যেমন জগতের ভাগ্যবিধাতা, তেমনি একই বিধান সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা। যুবরাজ দারা! তোমার ছিল দুর্ব্বলতা, তোমার ছিল অহঙ্কার। অহঙ্কারই রচনা করল তোমার পতন! তোমার বিরুদ্ধ দলের ছিল শক্তি, আওরঙ্গজেবের ছিল কৌশল।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি, হে খলরাজ আওরঙ্গজেব! তোমাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। তোমার প্রতিভা যেমন তীব্র, তোমার হৃদয় তেমনি কঠিন। তোমার একমাত্র চিন্তা—তুমি হবে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট, তুমি হবে মানুষের দেহমন দুটিরই অধীশ্বর! তোমার নয়নে ভাসছে অপূর্ব্ব সস্মিত হাসি, আর তোমার পদতলে দলিত হচ্ছে— তোমার বিরুদ্ধাচারী শত্রু। মনে পড়ে তোমার? শৈশবের সেই পরিব্রাজকের ভবিষ্যৎ বাণী? (২)

(১) মুঘল সম্রাটগণের হস্তী ও অশ্বপ্রীতি অসীম, প্রত্যেকটি রাজকীয় হস্তীর নামকরণ করা হত। "হস্তী-যুদ্ধ" সম্রাট পরিবারের একাধিকার ছিল; হস্তী রাজোপহারের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। পরাজিত শত্রুর সম্পদের মধ্যে হস্তী সম্রাটের অবশ্য প্রাপ্য ছিল। আকবরের হস্তীর নাম ছিল ফিল্-ই-ইলাহি (আল্লাহ্‌র হস্তী), জাহাঙ্গীরের হস্তীর নাম নুর-ই-ফিল্ (হস্তীর আলো), দারাশুকোর হস্তী ছিল ফতেজঙ্গ (যুদ্ধ বিজয়ী)।

(২) কথিত আছে যে, একজন পরিব্রাজক মুঘলরাজবংশধরদের হস্ত পরীক্ষা করে

আবার শুনছি—অশ্ব গজের পদধ্বনি, কিন্তু এবার সৈন্যদল অতি ক্ষুদ্র। তারা প্রত্যাবর্ত্তন করছে দিল্লীর পথে—প্রতারিত, পরাজিত বিপর্য্যস্ত দারা। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুগণ দারাকে পরাস্ত করে নি, শত্রুর অস্ত্র ছিল সুচতুর কৌশল। যে যুবরাজ দারা এক বৎসর পূর্ব্বেও পিতার পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তিনি আজ চলেছেন দিল্লীর রাজপথে আভরণহীন অনাবৃত রুগ্ন হস্তী পৃষ্ঠে—নিরাভরণ দারা, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দারা, "দাসাৎ অপি দীনতম" শৃঙ্খলাবদ্ধ দারা। প্রজাকুল এই দৃশ্যে বিচলিত, পুরবাসী আওরঙ্গজেবকে অন্তরে অভিশাপ দিচ্ছে, পুরমহিলারা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুসিক্ত; কিন্তু কারও সাহস নেই যে স্পষ্ট প্রতিবাদ করে।

আমি আগ্রার দুর্গে এক বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে মৃদু আলোক শিখার পার্শ্বে বসে কম্পিত হস্তে লিখছি আমার এই আত্মকাহিনী, কিন্তু আমার অন্তরের গোপন কথা আমি গোপনই রাখছি। যদি তাই না করি, তবে আমি জীবনধারণ করব কি করে? আমি যে নারীমাত্র! কিন্তু এইখানে এই নির্জ্জন রাত্রিতে আমি আমার দুঃখের সঙ্গীত বিস্মৃতিকে দিয়ে যাব, আমি বিস্মৃতির কাছে গচ্ছিত রেখে যাব আমার জীবনের দুঃখ আর গাঁথা।

আমার প্রিয় ছিল আমার সহোদর দারা, আমি তাঁর অনুরক্ত ভগিনী ছিলাম। দারার অভিপ্রায় ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট আকবরের স্বপ্ন সম্ভব করে তুলবেন। শাশ্বত হয়ে থাকুক সেই শাশ্বত পুরুষের শাশ্বত প্রয়াস! অন্ধকার গহ্বরে সুগুপ্ত ভারতের ধনরত্ন সম্রাট

সমস্ত রাজকুমারদের ভবিষ্যৎ বলেছিলেন। আওরঙ্গজেবকে বলেছিলেন—তুমি হবে তৈমুরবংশের বিনাশকর্ত্তা। মুঘল রাজগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সামুদ্রিক বিচার বিশ্বাস করতেন। এমন কি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নক্ষত্রের গতির উপর সৈন্যচালনা নির্ভর করত। রাজবংশের সমস্ত সন্তানের জন্ম কুণ্ডলী ও কোষ্ঠি তৈরী করা হত।

আকবরকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। অযুত যুগ ধরে মানুষ যে চিন্তা করেছিল, যে সত্য উপলব্ধি করেছিল, সম্রাট আকবর সেই প্রনষ্ট ধন উদ্ধারের প্রয়াস করেছিলেন। সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন—ভারত তার অতীত আত্মার সন্ধানে ফিরে যাচ্ছে, ভারত তার আত্মার সৌন্দর্য্যগৌরবে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে উঠবে—সৌন্দর্য্য একদিন ভারতকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

যমুনার অপর তীরে ফুটে উঠেছে তাজমহল—পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে তাজ ফুটে উঠেছে যেন শুভ্র হীরকখণ্ড—মৃত্যু-পরীর পাখার মতন শুভ্র সমুজ্জ্বল। সমাধি পরিবৃতা মাতা তাজবিবির কানে কানে মৃত্যুগুঞ্জনে ধ্বনিত হ'ত কোরাণের পুণ্যবাণী (৩)। আজ আর তাজবিবির কর্ণে প্রবেশ করে না সেই সঙ্গীত। মাতার সমাধি পার্শ্বে প্রোথিত রয়েছে দারার রক্তাপ্লুত ছিন্ন মুণ্ড। আজ মায়ের অস্থিখণ্ডে লাগছে এক শীতের কম্পন। তাজ কি আজ তাঁর চিরনিদ্রার মাঝে ভাবছেন—আমার পুত্রের মুণ্ড যে দিন স্কন্ধচ্যুত হয়েছিল, সেই দিনই পৃথিবীতে একটি বিরাট আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল ?

ঐ দেখ সূর্য্য উঠছে তাজমহলের শুভ্র মিনারের অপর পার্শ্বে—তাজ আর শুভ্র হীরক খণ্ড নয়, এক বিরাট রক্তবিন্দু মাত্র।

আওরঙ্গজেব ! তোমাকে অভিসম্পাত করি, ভাগ্যহীন দারাকে তুমি পদদলিত করেছ, তুমি তাকে নিরীশ্বরবাদী অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছ (৪)।

(৩) অভিজাত মুসলিম পরিবারের সমাধির পাশে কোরাণ আবৃত্তি করার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। সুর-লয়-সমন্বিত কোরাণের আবৃত্তি দূর থেকে সঙ্গীতের মত শোনায়।

(৪) পরাজিত দারা শুকোকে "নিরীশ্বরবাদী" অপবাদে বিচার করা হয়। মুসলিম

আওরঙ্গজেব! তুমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের গোয়ালিয়র দুর্গে আফিঙের বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছ (৫)—আমাকে সে বিষ দিলে না কেন? তা হলে আমার অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যেত, আমার চিন্তা নৈরাশ্যের গভীরতা অনুভব করতে পারত না, আমি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম।

আওরঙ্গজেব, আজ রজনীতেও আমি বেঁচে আছি—আমি চিন্তা করতে পারছি। আমি নীরবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বার্ত্তা প্রেরণ করছি, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করে আমার বার্ত্তা তোমার নিকট পৌঁছবে। আজ নিশীথে এক গুপ্ত শক্তি আমার ইন্দ্রিয়গ্রামকে আচ্ছন্ন করেছে········

ঘনকৃষ্ণ ছায়ারাশি মাটির উপরে ভেসে আসছে, তুমি বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ না। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ঐ যে কালো ছায়া মূর্ত্তি—কুব্জ পৃষ্ঠ নুব্জ দেহ—হঠাৎ সে ছায়া মূর্ত্তিগুলি এক সঙ্গে আকাশে উঠছে, ঐ যে সেই মূর্ত্তি মেঘে রূপান্তরিত হচ্ছে, তারপর ঝঞ্ঝা, ঐ দেখ

রীতি অনুসারে নিরীশ্বরবাদীর মৃত্যুদণ্ডের বহু নিদর্শন আছে। কিন্তু সে দণ্ডের বৈধতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দারা যথার্থ ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) মুঘল যুগে রাজবংশের সন্তানদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে প্রায়ই গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হত। গোয়ালিয়র দুর্গ অনেকটা ইংলণ্ডের টাওয়ার অব লণ্ডন অথবা ফরাসীদেশের বাস্তিল্ দুর্গের মত। মুঘল রাজবংশের সন্তানদের অনেক সময় হত্যা না করে স্বল্প মাত্রায় আফিঙের জল পান কর্ত্তে দেওয়া হ'ত। আফিঙের বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার বুদ্ধিভ্রংশ করে দিত, ক্রমশঃ তার অনুভূতি অস্পষ্ট হয়ে যেত। আফিঙ-বিষে জর্জ্জরিত মানুষের জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টদায়ক। তুর্ক জাতির মধ্যেও এই আফিঙ-বিষ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তুরস্কে ওসমানালী বংশে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—রাজকুলের কোন আত্মীয় নেই। একাধিক ভ্রাতার জন্ম রাজকুলে অমঙ্গল বলে বিবেচিত হ'ত।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অগ্নির লেলিহান শিখা উঠ্‌ছে, সমস্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কুব্জ পৃষ্ঠ থেকে তোমার শৃঙ্খল খসে পড়বে। ভীষণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সম্রাট আকবরের স্বপ্ন—তৈমুর বংশের ছত্রাধীনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বিলীন হয়ে যাবে।

আওরঙ্গজেব। আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি—হে শক্তিমান্, তুমি ভগবানকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস না। তোমাকেও মানুষ ভয় করবে, ভালবাসবে না: সম্রাট আকবর যখন একখণ্ড তাম্রমুদ্রা দান করতেন, সে মুদ্রা স্বর্ণ-খণ্ডে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু তুমি যা' দান কর, তা কণ্টকে পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠে। সম্রাট আকবর মিলনের প্রয়াস করেছিলেন—আর তুমি ধ্বংসের অভিযান করে চলেছ। আমি তোমাকে অভিসম্পাত করছি—আওরঙ্গজেব। তুমি তোমার পিতার প্রতি যে ব্যবহার করেছ তা' তুমি সমস্ত জীবনে ভুলতে পারবে না: তুমি যে পথে চলবে, সমস্ত জীবন ধরে সে পথে তোমার ছায়া তোমাকে অতিক্রম করে যাবে, তোমাকে বিপথে পরিচালিত করবে। পবিত্র কোরাণের কোন বাণী তোমাকে তোমার ছায়ার আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

হিন্দুস্থান আজ বিজেতার ক্রীতদাসী। কখনো লোভে, কখনো ঘৃণায় হিন্দুস্থান লুণ্ঠিত হয়েছে। যদি কোন বিরাটের প্রেরণা নিয়ে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা করা হ'ত তবে ভারতবর্ষ নিশ্চয় তার সমস্ত সন্তানের জননী হতে পারত। আজও হয়ত দিল্লীর প্রাসাদে ময়ূরসিংহাসন নিজের উজ্জ্বলতায় শোভা পাচ্ছে, কিন্তু সিংহাসনের মণিমাণিক্য দূর থেকে আহ্বান করছে বিপদ—যেমন চুম্বক আহ্বান করে লোহকে।

দূর থেকে আসছে এক শীতল প্রভঞ্জন। আমি শিউরে উঠ্‌ছি, সে হচ্ছে ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত, রক্তসমুদ্রের দূত। শক্তিশালী সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হয় রাজ্যের বিধান, রক্তপ্রবাহ মুছে নিয়ে যায় সে পদচিহ্ন। রাত্রিতে শুনতে পাচ্ছি সমস্ত দিল্লীব্যাপী এক বিরাট ক্রন্দন রোল—

যেমন উঠেছিল আর একবার তৈমুরের দিল্লী অভিযানের দিনে। আর একবার উঠ্‌ছে পাণিপথের প্রবল ঝড়।

মৃত মানবই একমাত্র শান্তির অধিকারী—না না, তারাও নয়। ধনরত্ন লোভে কি মৃতের সমাধি অবমানিত হয় নি? আমি কিন্তু মূল্যবান প্রস্তর অথবা মর্ম্মরবেদীর নিম্নে সমাধিস্থ হতে চাই না, একমাত্র তৃণই হবে আমার সমাধির আবরণ! যদি কোনদিন চরণাঘাতে দলিত হয়, তবু তৃণখণ্ড আবার নতুন হয়ে জন্মাবে।

ভগবান পদদলিতকে কোলে তুলে নেন।

দ্বিতীয় স্তবক

[আত্মকাহিনীর ছিন্নপত্রের পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায় নি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের মধ্যে বহুদিনের কাহিনী অবলুপ্ত]

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে: বাতাস মৃদুগতি, সুন্দর পুষ্পগন্ধে ধরণী আমোদিত হচ্ছে, আগ্রাপ্রাসাদের অঙ্গুরীবাগের (৬) প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গে আমার একটি অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

রক্তকরবী ফুলের রক্তস্তবক দেখে মনে হচ্ছে যেন ভোজনাগারের পথে রক্ত-আলোর শিখা। আমার ভ্রাতাদের বিবাহের উৎসবে আমি কত রজনীতে এই রক্তকরবীগুচ্ছ দিয়ে বাসর ঘরে মালা গেঁথেছি। নীলাভ অতসী মৃদু বাতাসে দুলছে—তাদের মিষ্ট গন্ধ বাতাসের সঙ্গে এক দুঃখের নিঃশ্বাস বয়ে আনছে, আমি অতীতে স্মৃতিভারে জড়িয়ে আছি।

দেওয়ান-ই-আমের (৭) সঙ্গীত নিস্তব্ধ, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক করুণ সুর। মনে হচ্ছে যেন রক্তগোলাপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে "দুলেরার" (৮) সঙ্গীত। সঙ্গীতের ছন্দের শিহরণ এই দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে আমার কামনার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছায়। আমি দুলেরার নাম দিয়েছি "রাজা"। দুলেরার বাহুপাশে আমি উত্তেজনাকে আনন্দমুহূর্ত বলে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত আমাকে নিয়ে গেছে সেই রাজ্যে—যেখানে আমার চরণ কখনও ভূমিস্পর্শ

(৬) আগ্রা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের জন্য নির্দিষ্ট দেওয়ান-ই-আমের অপর পার্শ্বে সংলগ্ন উদ্যান।

(৭) মুঘল রাজপ্রাসাদের সাধারণ দরবার কক্ষ।

(৮) শাহজাহানের বিশ্বস্ত রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রশালের ছদ্মনাম।

করে নি। আজ তাঁর রূপ আমার স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু তাঁর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি······

দিল্লীর প্রাসাদে শালিমার বাগে মধুমক্ষিকার মত আমি উড়ে বেড়িয়েছি; প্রতিমুহূর্ত্তে পুষ্পপুত্রে খুঁজে বেড়িয়েছি উত্তেজনা। প্রতিমুহূর্ত্তে সে উত্তেজনায় এগিয়ে এসেছে নিশীথিনীর প্রান্তে অন্ধকার মৃত্যুর অন্বেষণে। মণিমাণিক্যোজ্জ্বল মক্ষিরাণী স্বর্ণরেণু পাখায় মেখে নৃত্য করতে করতে সূর্য্যের দিকে ছুটে চলেছে; চিরন্তন আলোর সাথে সে নব-জীবন লাভ করবে, সে মরবে না—কারণ আকাশে তারার মালা জ্বলছে।

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি, আমার কল্পলোকে পৌঁছবার আগেই যদি আমার রূপ ম্লান হয়ে যায়, তখন ত আমি আর সেই বেগম জাহানারা থাকব না। আমার প্রিয়তমের হৃদয়রাণী হয়ে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত শেষ করতে পাব না। ভাগ্যদেবীর পানপাত্র পান করেছি আমি আকণ্ঠ। তবু আজও আমি তৃষাতুরা।

ঐ অস্তসূর্য্যের রক্তরশ্মি জীর্ণ পত্রশিরে সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। তেমনি আমার প্রিয় "রাজার" শিরে আমি পরিয়ে দিচ্ছি স্মৃতির মুকুট।

আজও সেই স্মৃতি অম্লান। যেদিন দেওয়ান-ই-আমের দরবার কক্ষে আমার প্রিয়তম প্রথম সম্রাট শাহজাহানকে অভিবাদন করেছিলেন, সেদিন আমি ছিলাম তরুণী; অশ্বারোহীর দল চোখের দৃষ্টি অতিক্রম করে চলে গেল। বাঁশীর সুর, করতলের ধ্বনি শান্ত—চারিদিকে গভীর নীরবতা, আমি মহলের ঝারোখার (৯) পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ

---

(৯) মুঘল স্থপতিতে 'াচীর ও জানালার পার্শ্বে পাথর কিংবা মশল্লা দিয়ে তৈরী জালের কাজ—অপরিবর্ত্তনীয় পর্দ্দার মত ব্যবহার করা যায়।

আমার রাজা ধীর পদক্ষেপে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার সমস্ত রক্ত দেহের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। একি নিষাদরাজ নল (১০)? রাজা নল কি আবার মর্ত্তে্য অবতীর্ণ হয়েছেন? তাঁর চক্ষে ভাসছে অপরূপ জ্যোতি—মনে হচ্ছে যেন অতিদূরে বহুদূর-দৃষ্ট স্বপ্নের আবেশ! তাঁর অবয়বে রয়েছে তাঁর ক্ষত্রোচিত শৌর্য্য ও মর্য্যাদার পরিচয়—ক্ষত্রিয় বংশই ভারতবর্ষ শাসন করার উপযুক্ত বটে। যে মুহূর্ত্তে চারণ তার বীণার সুরে মৃত্যুর গানের ঝঙ্কার দেয—রাজপুত কৃসংকায় অশ্বকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আনে। দময়ন্তী যেমন একদিন দেবতাদের ত্যাগ করে নলকে বরণ করেছিলেন, আমিও আমার অন্তরে তেমনি এই রাজপুতের উদ্দেশে আমাকে নিবেদন করেছিলাম। এমন নতি এর পূর্ব্বে কারো কাছে স্বীকার করি নি—এর পরেও করি নি। প্রথম দরশনে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের পূজা সমর্পণ করলাম। প্রথম দরশনেই তিনি আমার অন্তরের দেবতা—আজও তিনি আমার দেবতাই আছেন।

প্রজাপতি সূর্য্যের আলোয় নৃত্য করছে—আমি আমার শাশ্বতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব, সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে আমি জয় করব। পৃথিবীর অপর তীরে আমি আমার রাজার অনুসরণ করব আমার সীমাহীন কামনা রাজ্যের মধ্য দিয়ে—সেখানে আমার কোনও শঙ্কা নাই।

আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেব সঙ্গীত নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

(১০) মহাভারত বর্ণিত রাজা নল (দময়ন্তীর স্বামী)। স্বয়ম্বর সভায় দেবতাকে উপেক্ষা করে দময়ন্তী নলরাজাকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। জাহানারা হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে হিন্দুশাস্ত্রালোচনার বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্গীত-শিল্পিগণ তাদের বাদ্যযন্ত্র শবযাত্রার সমারোহে সমাধিস্থ করেছে (১১)। কিন্তু সম্রাটের কোনও অনুশাসনই আমার অন্তরের সঙ্গীতকে স্তব্ধ করতে পারে নি।

প্রাচীরের মত কঠোর অদৃষ্ট আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মুঘল রাজকুমারীর বিবাহ হবে না—এই ছিল সম্রাট আকবরের আদেশ। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সম্রাট আকবর মুঘল রাজকুমারীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দূরে ঐ প্রাসাদের অপর প্রান্তে গিরিশিখরে আর একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। সেই প্রাসাদের শুভ্র মর্ম্মর তোরণ আর স্বর্ণখচিতদ্বার ঐ শান্ত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। জলধারার অন্তরে বাহিরে অপার নিস্তব্ধতা। কারণ, আজ তাঁর সত্তা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁকে বেষ্টন করে আমি রচনা করতাম আমার রাজসভা। সেই সভায় মুঘল রাজকুমারীর ভোজ-উৎসবে স্বর্গের দেবতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতেন। সে ভোজন কক্ষে সুশীতল মর্ম্মর শিলাতলে নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ কম্পন জাগাত। ভোজনের অবসরে রত্নখচিত পাত্রে কাবুল কাশ্মীরের সুরাধারা চিন্তার স্রোতকে স্তব্ধ করে দিত। না, না, আমি আমার ভ্রাতা দারার স্বপ্ন সফল করে দিতাম। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি—দু'ধারার মিলন করিয়ে দিতাম। মরমী সুফী সাধু সন্ত যোগীদের প্রেমবারি সিঞ্চন করে অমূল্য সুরাসার (১২) তৈরী

(১১) আওরঙ্গজেব সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার পর সঙ্গীত-শিল্পিগণ একদিন এক শবযাত্রা বের করেছিল। কৌতূহলী হয়ে যখন আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন—"কার শবযাত্রা?" উত্তর পেলেন—"সঙ্গীতের।" আওরঙ্গজেব বললেন—"কবর যেন ভাল ভাবে দেওয়া হয়।"

(১২) সুফী পরিভাষায় "সুরা" প্রেমের অপর নাম।

করে দিতাম। সে সুরা রূপ নিত কাব্যের ঝঙ্কারে, ভাষার মূর্চ্ছনায়। মনে পড়ে একদিন সম্রাট আকবরের রাজসভায়······

ঐ শোন স্রোতস্বিনীর বুকে জলের স্বল্প কলতান—অঙ্গুরীবাগের পাশ দিয়ে চলেছে যমুনার স্বচ্ছ শ্রান্ত জলধারা। পত্রমর্ম্মর শুনতে পাচ্ছি। আজ আমার কর্ণে এই শান্ত করুণ শব্দ দিল্লীর নহবৎখানার ঐক্যতানের মত মুখর হয়ে উঠেছে। এই স্রোতস্বিনীর তানে আমার কাছে ফিরে আসছে ফিরোজসাহের পরিখার পাশে আমার উদ্যান-বাটিকার পুরাতন স্মৃতি। ঐ করতালের কলরোল, ঐ বীণার ঝঙ্কার আজ যমুনার জলে ভেসে এসে আমার দিবাবসানে শ্মশানের চিতার ধূমশিখা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐ দিল্লীর প্রাসাদের ঐক্যতান সঙ্গীত যেন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মানুষের আর্ত্তনাদ—আমার অভিশাপের ভগ্নদূত।

তখনও আমার ভ্রাতা শুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন নি, তখনও সেই রাজপুরীর পাশ দিয়ে অসংখ্য নাগিনীর অভিযান (১৩) তার দৃষ্টিপথে ধরা দেয় নি। একদা একটি ক্ষুদ্র শ্বেত সর্প বিরাট কাল ফণিনীর শিরে বসেছিল (১৪)। অর্থলোভী গণক তাকে তখনও বলে নি যে, সেটি ছিল শুজার ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত। তখনও ভ্রাতৃবিরোধের শিখা জলে ওঠে নি। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ মাত্র মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে

(১৩) কথিত আছে শাহ শুজার প্রমোদকক্ষের সম্মুখ দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক সহস্র নারী পথ অতিক্রম করত। সে দৃশ্য শুজার নয়ন চরিতার্থ করত।

(১৪) মুঘল রাজবংশে জ্যোতিষ চর্চ্চার অত্যন্ত প্রসার ছিল। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য রাজ-জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হ'ত। এক দিন একটি কাল-সর্পের মস্তকোপরি সমাসীন একটি ক্ষুদ্র শ্বেতসর্প রাজপুরীর প্রাঙ্গণে দেখা গিয়েছিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যাখ্যার জন্য রাজ-জ্যোতিষী আহূত হন। জাহানারার জীবনীতে সেই ঘটনারই ইঙ্গিত রয়েছে।

ছড়িয়ে পড়ছিল। উৎসব দিনের বিপণিতে সূর্য্যের শেষ রশ্মি-রেখার মত রাজপ্রাসাদে তার উৎসবের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে।

আমার উদ্যানবাটিকায় আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম। আমার রাখী-বন্ধ ভাই (১৫) কি আসবে না? যখন হিন্দুস্থানে সমস্ত বৈরীশক্তি উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন না? কোন-নারী কি তাঁকে আমার চেয়ে মূল্যবান রাখীবন্ধন দিয়েছে? আমি আমার যুযুধান ভ্রাতাকে যে প্রীতির বন্ধনে বেঁধে দিয়েছি তার মূল্য যে অমূল্য।

আমার প্রিয়তম এসেছিলেন যখন প্রথম সন্ধ্যাতারা আকাশে উঠেছিল—তখন সূর্য্যাস্তের সলজ্জ আকাশে রক্তিমরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর আগমনের পদধ্বনি শুনে আমি নতজানু হয়ে অভিবাদন করলাম।

(১৫) মুঘল সমাজ-জীবনে হিন্দুর রাখীবন্ধ উৎসব সাদরে সমাপন করা হ'ত। প্রতি বৎসর নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনের সখ্যের চিহ্নস্বরূপ রাখী প্রেরণ করে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করা হ'ত। বুন্দেলা পরিবারের সঙ্গে এমনি করে গড়ে উঠেছিল তৈমুর পরিবারের প্রীতির বন্ধন। জাহানারার রাখীবন্ধ ভাই ছিলেন ছত্রশাল বুন্দেলা বা "দুলেরা"।

তৃতীয় স্তবক

*　　*　　*　　*

আমি শুনছি প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর। অনবদ্য ভাষায় তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন যবনিকার অপর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, সে যবনিকা যে ভাগ্যপ্রাচীরের মতন আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। আমি দণ্ডায়মান হয়ে প্রিয়তমকে অভিনন্দন জানালাম। তিনি যে আমার বিশ্ব-জগতের সম্রাট। তাঁরই ভাষায় আমি তাঁর আগমনের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন—

"সম্রাটনন্দিনী কি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন?" তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সূর্য্যের দীপ্তি, সমুদ্রের প্রাচুর্য্য। আমি ঝারোখার মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম স্বর্ণাভ সন্ধ্যাকাশের প্রচ্ছদপটে প্রিয়তমের শুভ্র উষ্ণীষ, অতীতের চেয়েও উচ্চ তাঁর শির। তিনি যে অনেক যুদ্ধের বিজয়ী বীর। আবার তিনি বল্লেন—"সম্রাটকুমারী আপনার শ্রদ্ধাস্পদ পিতা একদিন তাঁর দুঃসময়ে (১৬) উদয়পুরে এসেছিলেন—তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আমরা একটি সম্মান তোরণ রচনা করেছিলাম। সেই তোরণে জ্বলছে নিশিদিন দীপশিখা, যতদিন একটি রাজপুত্র জীবিত থাকবে, ততদিন সেই দীপ-শিখা থাকবে অনির্ব্বাণ। যতদিন আমার বাহুতে শক্তি থাকবে, আমার তরবারি সম্রাটকুমারীর সম্মানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।"

ঝারোখার উপর আমার অধরপুট ন্যস্ত ক'রে আমি উদ্বেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলাম—"কিন্তু রাজপুতের সম্মান!"

প্রিয়তমের অধরপুট থেকে হাসির রেখা মলিন হয়ে গেল। তিনি

(১৬) শাহজাদা শাহজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চিতোরে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, চিতোর-রাণা আশ্রিতকে সাহায্য দান করেছিলেন।

বলতে লাগলেন—"দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণই এই দেশের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে! বাদশা বেগম, আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনার রক্তে রয়েছে রাজস্থানের রক্তবিন্দু; একদিন রাণা সমর সিং অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে দিল্লী আজমীর রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে। সেই বীরকুমারের কীর্ত্তিগৌরবে আপনিও সমুজ্জ্বল। যুদ্ধের সময় একদা গভীর নিশীথে সমর সিং দেখলেন—এক অবগুণ্ঠিতা নারী। অকস্মাৎ তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে গেল—অপূর্ব্ব সেই মুখশ্রী। সমর সিং শুনলেন ভবিষ্যৎ বাণী—'বীর! তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব লুপ্ত হয়ে যাবে।' দিল্লীর পতন হল; বহু শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে—দিল্লীর গৌরব ধূলায় অবলুণ্ঠিত! আমরা রাজপুত—আমাদের উপর হিন্দুস্থানের পূত গিরিনদী রক্ষার ভার, অথচ আমরা আজও আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনার পূর্ব্বপুরুষ কনৌজকুমারী সংযুক্তার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর প্রিয়তম পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সংযুক্তা কি বলেছিলেন তা' আপনার স্মরণ আছে ত—'বীরের মৃত্যু মানুষকে করে অমরত্ব দান। আমার জন্য চিন্তিত হয়ো না প্রিয়তম, অমরত্বের কথা চিন্তা কর। শত্রুকে দ্বিখণ্ডিত কর, মৃত্যুর অপর পারে আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হবো।' যখন পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হলেন, সংযুক্তা সহমরণের চিতায় আরোহণ করে বলেছিলেন—'তোমায় আমায় আবার মিলন হবে পরপারে, স্বর্গে।' 'যোগিনীপুরে (১৭) তোমার সাক্ষাৎ পাব না।' আমার প্রিয়তম 'দুলেরা' কি বিশ্বাস করেন যে, ইহলোকে যাদের মিলন হয় নি পরলোকে তাদের মিলন সম্ভব?"

(১৭) যোগিনীপুর পৃথ্বীরাজের রাজধানীর নাম।

আমার যুগ যুগ সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

প্রিয়তমের মুখে ভেসে উঠল এক অপূর্ব্ব সস্মিত হাসির রেখা, সেই হাসির রেখার মধ্যেই আমি খুঁজে পেলাম আমার প্রশ্নের উত্তর। সেই উত্তর হল, একমাত্র চিতার অগ্নিশিখাই মানুষের আত্মাকে নির্ম্মল করে দেয় না! জটিল সমস্যার উত্তরে একটি মাত্র শব্দ যেমন সমস্ত সমাধান করে দেয়, তেমনি একটি হৃদয়ের স্পর্শ অন্য একটি হৃদয়কে সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ভগবানের পথে মুক্তি দেয়—সে মুক্তি ইহলোকেই হউক, বা পরলোকেই হউক।"

এই কয়টি শব্দ আমার মনকে আশীর্ব্বাদ বারি সিঞ্চিত করে দিল। আমি ঝারোখার অতি নিকটে অগ্রসর হয়ে এলাম—এই ঝারোখাই আমাকে আনন্দলোক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বিজেতার পদপ্রান্তে যেমন অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে দুর্গপ্রাচীর, তেমনি যদি এই ঝারোখা আমার সম্মুখে লুটিয়ে পড়ত। আনন্দের শিহরণে আমি কম্পিত হয়ে উঠলাম। আমি ভাষার আভরণ দিয়ে আমার সরমের আবরণ রচনা করলাম। আমি দেখলাম দুলেরার অধরে সস্মিত হাসি।

* * * * *

ললাটের লিখন কে করিবে খণ্ডন ?

* * * * *

আলোর মালা জ্বলে উঠল, আকাশের বুকে তারার মালা কে সাজিয়ে দিল ? দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গীত থেমে গেছে, একমাত্র জলকলতান আমার শ্রুতিগোচর হচ্ছিল। আমার বক্ষ স্পন্দনের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। আমরা অতি মৃদুস্বরে অন্যের অগোচরে আলাপ করলাম।

আমরা ভবিষ্যতের বিষয় জল্পনা করলাম—"আপনি আমরণ আমার পিতা শাহজাহান এবং ভ্রাতা দারার প্রতি অনুরক্ত থাকবেন ?"

তিনি হেসে বলে উঠলেন—"একদিন সম্রাট আকবর দিগন্তবিস্তৃত ভারতের সম্রাট ছিলেন। আর প্রতাপ সিং ছিলেন বহু যুদ্ধের নায়ক, ক্ষুদ্র রাজ্য মেবারের রাণা। রাণা প্রতাপ ছিলেন সমর সিং-এর বংশজ সন্তান। চিরস্মরণীয় আকবর স্বপ্ন দেখলেন—ভারতবর্ষ জয় করবেন, নিখিল ভারতের ঐক্য স্থাপন করবেন। প্রতাপ সিং স্থির করলেন—নিজের জন্মভূমি রক্ষা করবেন, তাঁর পূর্ব্বপুরুষের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখবেন। চিরন্তন হয়ে থাকুক প্রতাপ—যতদিন ভারতবর্ষে একটি ক্ষত্রিয় বেঁচে থাকবে ততদিন রাণা প্রতাপ বেঁচে থাকবেন······।"

সন্ধ্যার বাতাসে ধীরে অতি ধীরে ভেসে আসছিল দূর উদ্যান থেকে গোলাপের গন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল আমার স্মৃতিতে আমার শৈশবের আনন্দক্ষণগুলি। এমনি এক সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধা রাজপুতানী আমার মহলে বসে মেবার, বুন্দী, অম্বর রাজবংশের কীর্ত্তিগাথা শুনিয়ে যাচ্ছিল, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি আমার পরিচয় বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমি বিশ্বাস করলাম, আমি হিন্দুস্থানের রাজবংশের সন্তান। আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম, "আমার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ বাবর; প্রতাপ সিং ছিলেন বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সংগ্রামের পৌত্র। তৈমুরের রাজ্য ফরগণা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাদশাহ বাবর ভারতসম্রাট ইব্রাহিম লোদীর রাজ্য জয় করলেন। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী মাত্র সম্বল করে বাদশাহ বাবর রাজস্থানের সম্মিলিত সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আপনার মনে আছে, প্রিয়তম, বাদশাহ বাবর পরাজয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁর স্বর্ণ রৌপ্য খচিত সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—"আর সুরা স্পর্শ করবো না।" তাঁর মন পবিত্র হয়ে গেল। বাদশাহকে অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনশত হতাশ অনুচর প্রতিজ্ঞা করল—"আর সুরা স্পর্শ করবো না।" নূতন উন্মাদনায় ভরে উঠল তাদের প্রাণ। কোরাণ স্পর্শ করে তারা শপথ করল—"জয় অথবা মৃত্যু।" "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি

করে তারা বিরাট রাজপুত বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাণা সংগ্রাম সিং বিজয়ের মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। রাণা তখনও যেন কিসের অপেক্ষা করে আছেন? বাদশাহ বাবর বিজয়ী বীর রূপে অভিনন্দিত হলেন। বলুন ত' রাণা সংগ্রাম কার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন?"

প্রিয়তম ঝারোখার মধ্য দিয়েই আমার চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লেন—"আমরা ভারতবাসী, আমরা হিন্দু, অদৃষ্টকে বিশ্বাস করি। শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টের পেষণে অন্ধ হয়ে যাই। আমার মনে হয়, একমাত্র রাণা সংগ্রামসিংহ সর্ব্বশেষবার স্বাধীন ভারতের মোহনস্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তাঁকে ছলনা করেছিল। তিনি ছিলেন বিরাট যোদ্ধা, তাঁর শরীরে ছিল আশিটি যুদ্ধ ক্ষত-চিহ্ন; তিনি ছিলেন একচক্ষু, একহস্ত; ভয়ে বা আশঙ্কায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।"

হঠাৎ "ছুলেরা" হেসে উঠলেন—গম্ভীর উচ্ছ্বসিত হাসি সমুদ্রের ঢেউএর মতন, সে হাসি নির্ভীক। সমুদ্রের ঢেউ যেমন বেলাভূমিকে আঘাত করে—তাঁর কঠিন হাসি আমাকে তেমনি আঘাত করল। আমি চোখ ছুটি দিয়ে ঝারোখার প্রান্তদেশ স্পর্শ করলাম, যেন তাঁর নয়ন আমার নয়ন স্পর্শ করে। আমার মনে পড়ল চারণ বরদাই-এর গাঁথা—

স্বপ্নের মতন ফেলি দিয়া জীবনের পাত্রখানি
—সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল বীর পুঙ্গব
চলি গেল রণ-তীর্থ ভূমে।

আমি বল্লাম—"প্রিয়তম, রাজপুত মৃত্যুভয়ে ভীত, এই অপবাদ কেউ তাকে দেয় না!" তারপর আমরা সম্রাট আকবর এবং বীর প্রতাপ সিংহের কাহিনী আলোচনা করলাম।

তারপর প্রিয়তম বলে চল্লেন—"একাকী রাণা প্রতাপ তাঁর সামন্তদের নিয়ে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। রাজস্থানের

সমস্ত নরপতি দিল্লীর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরাই ত দিল্লীর অবলম্বন ও অলঙ্কার। তাঁরা সকলেই দিল্লীর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলেন। পঁচিশ বৎসর ধরে চল্ল সেই ভীষণ সংগ্রাম—আরাবল্লী পর্ব্বত-মালা হল রাণা প্রতাপের দুর্গ, আর বনানী হল রাণার রাজপুরী। রাণার শয্যা হল তৃণাস্তরণ ; যবের রুটী হল তাঁর রাজভোগ। সম্রাট আকবর বাপ্পারাওয়ের রাজধানী চিতোর নিষ্করুণ ভাবে লুণ্ঠন করলেন। আজও রাজপুতনার চারণ গেয়ে বেড়ায়—চিতোর ধ্বংসের সেই কাহিনী।

"আজ আর চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না ; আজ রাজপুরীর দামামাধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে। অতীতে রাণার দুর্গ প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ দামামাধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হত। সালুম্ব্রাধিপতি (১৮) সূর্য্যদ্বারের সম্মুখদেশে নিহত হওয়ার পর থেকে বাপ্পারাওয়ের বংশের কোন স্বাধীন নরপতিই সেই দ্বার অতিক্রম করে নি।

"তারপর সংবাদ এল রাণা প্রতাপ সন্ধি-প্রত্যাশী। রাণা প্রতাপ সমস্ত দৈন্য সহ্য করতে পারলেন, কিন্তু অরণ্যে সন্তানের উপবাসক্লিষ্ট দেহের দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না।

আকবরের রাজপুত সামন্তগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁরা সকলেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তবু তাঁরা রাণা প্রতাপের অকলঙ্ক চরিত্র স্মরণ করে গৌরব অনুভব করতেন, রাণাকে রাজপুত সমাজের গৌরব বলে সম্মান করতেন। যোদ্ধা কবি পৃথ্বীরাজ প্রতাপের নিকট লিখেছিলেন ; "হিন্দুই হবে হিন্দুর আশ্রয়।" এই লিপি পাঠ করে প্রতাপ আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন নূতন প্রেরণায়। এবারের অভিযান তাঁকে আরও মহিমামণ্ডিত করে তুল্ল। রাণা যেমন স্বাধীন জীবন যাপন করেছেন মৃত্যুর সময়ও তেমনি স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করলেন চিতোর দুর্গের বাইরে। রাণা প্রতাপের পুত্র অমর

---

১৮)। চিতোরের প্রধান সামন্ত নগর সালুম্ব্রা।

সিংহ শত্রুবিতাড়িত হয়ে আমাদের সম্রাট শাহজাহানের নিকট আনমিত করলেন রাজপুতের নীল পতাকা—সেই পতাকা কত যুগ ধরে রক্তরঞ্জিত হয়ে চিতোর গৌরব ঘোষণা করেছিল। রাণার চিতাভস্ম সূর্য্যদ্বারের (১৯) মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সে যে চিতোরের শেষ স্বাধীন রাণার চিতাভস্ম—সামন্ত নরপতির নয়…"

চিতোর সামন্ত নরপতি!! সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল উদ্যান বাটিকার স্তম্ভ বীথির মধ্য দিয়ে—সে স্বপ্ন কিন্তু দুলেরার কণ্ঠস্বরের মতন নয়। মনে হল যেন সেই ধ্বনি অন্য জগৎ থেকে এসেছিল।

তারপর দুলেরা বলে চল্লেন—যেন বহুদূরাগত কণ্ঠস্বর—"আজও চিতোর দুর্গে রাজপুতনারী অর্ঘ্য নিয়ে আসে দেবতার চরণে, যেমন নিয়ে আসত অতীত যুগে। আজও রাণী পাদ্মিনীর ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরের উপরে বসে কোকিল বসন্তের গান গেয়ে বেড়ায়। ভগ্ন স্তম্ভের উপর বসে ময়ূর তার বহুবর্ণশোভিত পুচ্ছ মেলে নৃত্য করে, রক্তগ্রীব সবুজ হিরামণ ভগ্ন মন্দির চূড়ায় বসে অপূর্ব্ব স্বরে ডাক দেয়। রাণা কুম্ভের মেঘচুম্বী বিজয়স্তম্ভ (২০) অতীত যুগের বহু গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে আনছে। তারা চিতোর ধ্বংসের কোন কাহিনীর সাক্ষী নয় অথচ বিজয়স্তম্ভগুলি বিজয়েরই মৌন সাক্ষী। বিজয়স্তম্ভের পাদদেশে চারণ কবি তার বীণার সুরে সুর মিলিয়ে বীর পুট্টা ও জয়মলের (২১)

(১৯)। সূর্য্যদ্বার চিতোর দুর্গের বৃহত্তম দ্বার। তার অপর দিকে ছিল রাজ-শ্মশান।

(২০)। রাণা কুম্ভ বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ যে স্তম্ভ নির্ম্মিত করেছিলেন তা' চিতোরে এখনো বর্ত্তমান রয়েছে।

(২১)। চিতোর অভিযানে আকবরকে বিভ্রান্ত করেছিলেন দুইজন রাজপুতবীর পুট্টা এবং জয়মল। তাঁদের মৃত্যুর পরে সম্রাট আকবর তাঁদের স্মরণে বিরাট স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজপুত নারী জহরব্রতে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন।

কাহিনী কীর্ত্তন করে। তাঁরা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে চিতোর রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। বীর পুট্টার জননী ও জায়া তরবারী হস্তে সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁরা স্বয়ং যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। আজও চারণ চিতোরে জহরব্রতের কাহিনী গেয়ে বেড়ায়। মহীয়সী রাজপুত মহিলা শত্রুর হস্তে বন্দিনী হয়ে আত্মরক্ষার জন্য অগ্নিশিখা আলিঙ্গন করে আত্মবিসর্জ্জন করেছিলেন। আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধের দিনে পদ্মিনী সমস্ত পুরনারীর পশ্চাতে ভূ-নিম্নে দুর্গ পথে চিতায় আরোহণ করেছিলেন। চারণের মুখে আজও শুনতে পাই সেই মরণের বাণী, সেই জীবনের কাহিনী—

সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে!

"বহুদূরে গহন বনে সিদ্ধ মহাপুরুষ বসে ছিলেন ধ্যাননিমগ্ন। তাঁর নয়ন থেকে অজ্ঞানাঞ্জন অপসারিত হয়ে গেছে! তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে—মানুষ যার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে, যার জন্য সংগ্রাম করে, যার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তার কোন মূল্যই নাই। তিনি সেই বিরাট ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং"—সমস্ত সুর তাঁর কাছে একটি মাত্র সঙ্গীতে নীল হয়ে যায়, সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্য একই আলোক-শিখায় মিলিত হয়ে যায়। সেই বিরাট আলোক-শিখা সিদ্ধ মহাপুরুষের আত্মাকে সমুজ্জ্বল করে দিয়েছে। তিনি এখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তির মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি করেছেন। সেই সিদ্ধ পুরুষই ছিলেন ভারতের প্রকৃত সম্রাট।

"এই সত্য সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একলিঙ্গের মন্দিরের বেদী উত্তোলন করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর কোরাণ রেখেছিলেন। তিনি চন্দ্রতারকাখচিত বিরাট আকাশের নীচে বসে উপাসনা করতেন। তাঁর বাসনা ছিল—সেই বিরাট পূজামণ্ডপে এসে

বিশ্বের প্রতি মানব তার পূজাবেদী রচনা করুক। সেই পরম বিদেশী আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, প্রাচীন যুগের ঋষির মতন তাঁর মধ্যে ছিল এক সুবিশাল অসাধারণ শক্তি। প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিকে সংহত করে তিনি হিন্দুকে দিলেন মুসলমানের পার্শ্বে সমান অধিকার।"

"রাণা প্রতাপের সঙ্গে রাজপুত স্বাধীনতার চিহ্ন শেষ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ভারতের মহিমার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কার করেছিল, যতদিন সম্রাট আকবরের আদর্শ তৈমুর বংশকে উদ্বোধিত করবে, ততদিন রাণা প্রতাপের বংশধরগণও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের তরবারী সাক্ষী করে শপথ করছি, যতদিন জীবিত থাকব রাজকুমারী জাহানারার জন্য, শাহজাদা দারার জন্য, সম্রাট শাহ-জাহানের জন্য জীবন উৎসর্গ করব…।"

এই কথা বলে ছুলেরা তাঁর তরবারী উর্দ্ধে উত্তোলন করলেন। তাঁর তরবারী মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে যেন জ্যোতিরেখার মতন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"……সেই শুভদিনের জন্য ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে পারে। একদিন নিশ্চয় সেই দিন আসবে……।"

চতুর্থ স্তবক

অনেক আলো নিভে গেছে, অনেক তারা তখন আকাশে জ্বলছিল। আমি আমার বারান্দায় বসে আছি, পদনিম্নে বয়ে যাচ্ছে অবিরাম জল-স্রোত—স্রোতস্বিনীতীরে দাঁড়িয়ে আছে তিন্‌তিড়ি বৃক্ষ। বৃক্ষ-পত্ররাজি আমার মাথার উপর রচনা করে দিয়েছে আবরণ।

তারপর দুলেরা অন্তর্হিত হলেন। আমি কিন্তু অনুভব করলাম, তাঁর সান্নিধ্য, সেই ঘন নীল কৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ। রাত্রির শীতলতা আমার জ্বলমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সুশীতল করে দিচ্ছিল। বহু যূথী ও মল্লিকা আমার বারান্দায় ফুটেছিল, আমি আলোর নিচে বসে শুভ্র পুষ্পে একটি মালা গাঁথলাম। দুলেরার পরিচ্ছদ ছিল শুভ্র, তার মধ্যস্থলে ছিল স্বর্ণখচিত কোমরবন্ধ। একমাত্র চন্দ্রের চিন্তায় যেমন সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলে যায়, তেমনি একমাত্র দুলেরার চিন্তায় আমার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তাঁর চিন্তা আমার জীবনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

আজকের মতন আকাশ আমার এত সান্নিধ্যে এসেছে কি কখনো? আজকের মতন আকাশ আমার কাছে অতি স্বচ্ছ পদ্মরাগমণিখচিত চন্দ্রাতপ। আজকের ধরণী আমার উৎসব কক্ষ; তারকারাজি আমার উৎসবের উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে জ্বলছে, নদীর জলকলতান আমার বীণার সঙ্গীত, আমি সমস্ত বিশ্বকে আমন্ত্রণ করেছি আমার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। আজ যে আমার স্বয়ংবর ......!

আমি যেন আমার পিতা সম্রাট শাহজাহানের নিকটে সুবর্ণখচিত সিংহাসনের পার্শ্বে বসেছিলাম। আমি দেখলাম—দেওয়ান-ই-আমে সমস্ত সামন্ত নরপতি এবং সম্ভ্রান্ত পরিষদ সমবেত। সর্ব্বশেষে এল আমার

দুলেরা—ধীর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, প্রথম দিনের মত উন্নত-গ্রীব, চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল ; পার্শ্বে তারকার মত সামন্তগণ নিষ্প্রভ। আমার ফুলের মালা দুলেরার অঙ্গ স্পর্শ করে গেল।

বাতাসের আন্দোলনে পত্র মর্ম্মরের মত দুলেরার নাম দিল্লীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিন্তু দেখলাম, প্রিয়তমের দু'টি নয়ন—সমুদ্রের মত গভীর, সূর্য্যের মত ভাস্বর। আমি আজ তাঁর মধ্যে সন্ধান পেলাম আমার দয়িতের—যাকে আমি চিরকাল সন্ধান করে বেড়িয়েছি। আমি পেয়েছি আমার গুরু—যিনি আমাকে সব কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁকে আমি চিরকাল অনুসরণ করতে পারি।

স্বামীবিহীনা নারী আর সূর্য্যহীন দিবস উভয়ই নিরর্থক।

আমি আমার অলিন্দে বসে স্বপ্ন দেখছি—বিবাহের উৎসব রাত্রিতে আলোর মালার মত খদ্যোৎমালা আমার পার্শ্বে নৃত্য করছে। চিন্তা শক্তির দ্বারা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার রহস্য শেখ ইদন-উল-আরাবী জানতেন। দুলেরার কাছে পত্র লিখতে আমার ইচ্ছা হল : সে পত্রে জানিয়ে দেব আমার অন্তর-গোপন বাসনা ; দারা যদি যুদ্ধে জয়ী হন তবে সম্রাট আকবরের বিধানকে (২২) পরিবর্ত্তিত করে দারা তাঁর ভগ্নীকে স্বেচ্ছায় বর বরণ করে নেবার অধিকার দেবে। আমি জানিয়ে দিতাম জানকী শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের সময় বলেছিলেন, "যদি আমার স্বামী রাজ-প্রাসাদে অথবা স্বর্গে দেবতার রথে বিচরণ করেন, যদি শূন্যলোকে বা গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করেন, তবু স্বামীর চরণচ্ছায়াই স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয়।

---

(২২) সম্রাট আকবরের বিধান ছিল চাঘতাই বংশের রাজকুমারীর বিবাহ হবে না : উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক মনোমালিন্য এবং সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসর সংকীর্ণ করা। অবশ্য সে উদ্দেশ্য শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নি। সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করে মুঘল বংশ ধ্বংস হল।

সহভ্রমণের সময় মর্ত্যলোকে ধূলিকণার ঝঞ্ঝা স্ত্রীর নিশ্বাস যদি রোধ করে, তবে সে ধূলিকণা হবে স্ত্রীর সুমধুর চন্দন-গন্ধ-বাহী কুম্‌কুম্।

আমি আমার কাহিনী আরও লিখতাম, কিন্তু দেখছি রাত্রির কোলে রক্তিম আভা। ঐ দেখ, সমুদ্রের কোলে অরুণ আভাস; অসময়ে আমার অঞ্চলের মালা শুকিয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে নূতন অরুণ উদয় হয়েছে। সে কি আমরণ আমার দিনগুলি আলোকিত করে রাখবে? আমার অন্তর আজ নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আমার হৃদয় ত' আমার বার্তা শুনে না—অন্য একজনের বার্ত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত। আমার সমস্ত অস্তিত্ব ফুলেরার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রিয়তমের মধ্য দিয়ে আমি বিশ্বচরাচরের ভিতর লীন হয়ে আছি, আমার আত্মা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, কাল ও অনন্তের মাঝে সমস্ত সীমা বিলীন হয়ে গেছে—গোপন রহস্যের অর্গল আজ আমার কাছে মুক্ত……।

প্রভাতের আকাশ আমার চিন্তার স্রোতকে বিরাটের দিকে নিয়ে চলেছে। স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ু-সমুদ্রে সূর্য্যের পার্শ্বে স্বর্গের নীল পরীরা পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে—তারা যেন সমস্ত ব্যোম পরিমাপ করে দেখবে। 'মিমাহান্' পাখী মর্ম্মর প্রাচীরের উপরে বসে আছে, প্রভাতের সঙ্গীত তার কণ্ঠে। নবপ্রস্ফুটিত গোলাপ তার সুগন্ধ ছড়িয়ে সূর্য্য দেবতার অর্ঘ্য সাজিয়েছে।

তারপর আমি শুনলাম, ফিরোজসাহের পরিখার অপর তীরে উষ্ট্রের ক্ষুরধ্বনি। বণিকদল চলেছে; তারা রাত্রির আগমনের পূর্ব্বেই দিনের কাজ সম্পন্ন করে নেবে। একটি পারস্য-সঙ্গীত প্রভাতকে আকুল করে দিয়েছে। আবু সাইদের প্রেমের গান মূর্ত্ত হয়ে উঠল আমার চোখে:—

সমাধির অভ্যন্তরে মৃত্তিকার অন্তরালে
ভঙ্গুর এ দেহ মোর মিশে যদি থাকে,
অস্থি মোর রহে যদি ধরার ধূলিতে মিশি—
জাগিয়া উঠিব আমি তোমারই ডাকে।
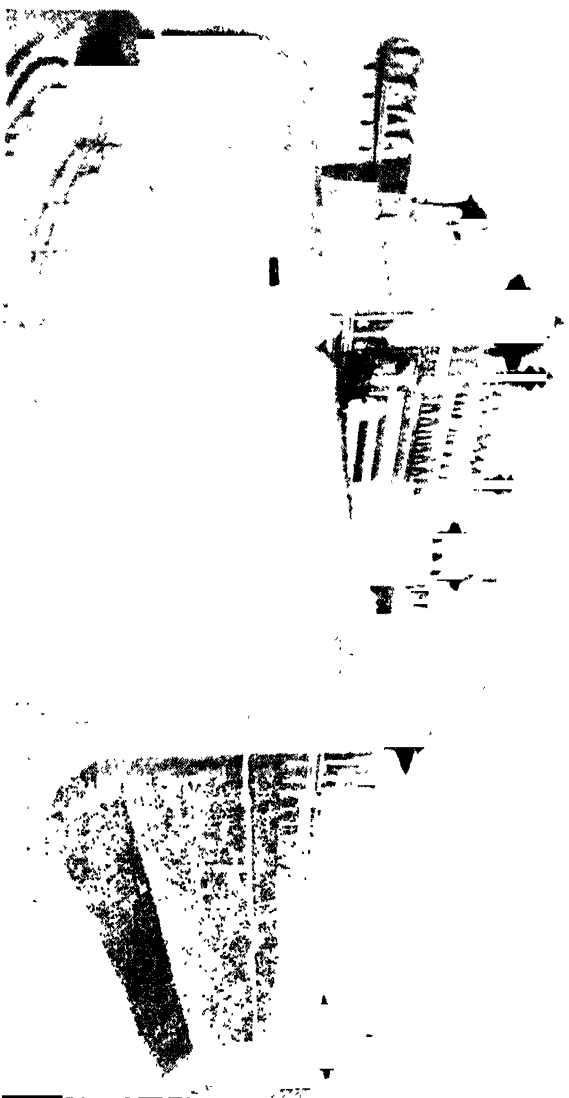
আগ্রার দুর্গ

এখানে জাহানারা বন্দিনী ছিলেন

২৬ পৃঃ

পঞ্চম স্তবক

অন্ধকার নেমে আসছে, আমি আঙ্গুরীবাগ থেকে আলোকোদ্ভাসিত 'জেসমিন' প্রাসাদে চলে যাচ্ছি। এখানে নীরবে একাকী বসে লিখতে পারব, এখানে কোন মানুষের পদধ্বনি আমার চিন্তাকে ব্যাহত করবে না। এখানে কোন মনুষ্য কণ্ঠ আমাকে আমার অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না—আমার অতীতকে জাগ্রত করবে না—আমার বাস্তব জীবনের সংবাদ বহন করে আনবে না। সম্রাট শাহ্জাহান আজ আমাকে আহ্বান করেছেন। আওরঙ্গজেব অনুগ্রহ করে পিতার কারাবাসের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কয়েকটি হস্তী ও ব্যাঘ্র পাঠিয়ে দিতে স্বীকার করেছেন। হতভাগ্য শাহ্জাহান! আজ রজনীতে আমি যাব না সম্রাটের কাছে; আজ সম্রাটের মহিষী ও কিঙ্করীর সঙ্গ-বিলাসের দিন। আমার অতীতের দুঃখ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে দিচ্ছে। আমি আমার দুঃখের কাহিনী আজ আমাকেই বলে যাব—আমি যে আজ আমার অচেনা বন্ধু! শেষ পর্য্যন্ত আমি লিখে যাব, যদিও জানি আমি যে, আমার লেখার সমাপ্তি কখনো হবে না······

আমি সে দিন প্রাসাদের ছাদে বসে বলেছিলাম যে, আমি পরদিন প্রিয়তমের কাছে পত্র লিখব। আমার নাজীর (কিঙ্করী) আমার নিকট তাঁর পত্রের উত্তর নিয়ে এসেছিল। আমি শিবিকারোহণে দিল্লীর অদূরে ভগ্নদুর্গের অনুরূপ একটি পুরাতন মস্জিদের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি জানতাম—সেখানে ছিল পরম শান্তি। আশাকম্পিত হৃদয় নিয়ে আমি মস্জিদের ভগ্ন সোপান অতিক্রম করলাম। বনফুলের তীব্র গন্ধ-মদিরা আমাকে বিভ্রান্ত করে দিল। একটা সবুজ পাখী প্রাচীরের উপরে বসেছিল; সে আমাকে কর্কশ স্বরে অভিনন্দন জানাল।

প্রবেশ পথের পার্শ্বে হরিণ চর্ম্মের উপর সমাসীন একজন সন্ন্যাসী, পার্শ্বে দণ্ড, করঙ্ক। তাঁর মস্তক শুভ্র উষ্ণীষ-শোভিত ; তিনি ধ্যান-নিমগ্ন। সেই প্রাচীন ঋষির অপূর্ব্ব রূপ। তিনি হিন্দু-শবদাহের মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। মন্ত্রের অর্থ ছিল—সে নির্ব্বোধ যে এই মরদেহের আবরণে অমরত্ব বাঞ্ছা করে—এই দেহ ত শিকামোর (২৩) বৃক্ষের শাখার মত ক্ষণভঙ্গুর, সমুদ্রের ফেনরাশির মত ক্ষণভঙ্গুর। সে সন্ন্যাসী ছিলেন দৃষ্টিহীন, তাঁর ভিক্ষা পাত্রে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিলাম—ভাবলাম যদি তিনি দিব্যচক্ষে আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পান। যোগী বল্লেন, "মা, তোমার স্বর্ণখণ্ড তুমি নিয়ে যাও।" আমার দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে বল্লেন, "তোমার আত্মা যে তোমার সন্তুষ্টির চেয়েও বড। তুমি কেন অন্য সন্তুষ্টির কামনা কর ?"

আমার ভাষা আমার অধরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল ; যোগী পুরুষ চলে গেলেন—আমার স্বর্ণমুদ্রাগুলি তাঁর পদতলে ফেলে দিলাম। সন্তুষ্টি ! আমার অন্তর সেই বস্তুটির জন্য কত আকাঙ্ক্ষিত।...

আমি কূপের পাশে বসে দুলেরার লিপিখানি পড়ে নিলাম, প্রত্যেক শব্দের মধ্যে ফুটে উঠেছিল তাঁর মহানুভবতা—অথচ তাঁর ভিতরে ছিল শিশুর সারল্য। তোমাকে অভিনন্দিত করি, 'হে আমার রাজা ! তুমি তোমার আনন্দ প্রকাশ করেছ, বলেছ—আমি তোমায় আনন্দ দিয়েছি। তোমার মহত্ত্বে তুমি মহীয়ান ; তুমি আমার প্রাণে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছ—সমস্ত পৃথিবী যেন এক প্রার্থনার সুরে ভরে গেছে। তুমি আমাকে "দেবী" বলে সম্বোধন করেছ। তুমি লিখেছ, আমি যদি সংযুক্তা হতাম, তুমি পৃথ্বীরাজ হয়ে কনৌজের দিকে অভিযান করতে। আজ আমার

(২৩)। **শিকামোর বৃক্ষ চির সবুজ, প্রতিদিনই তার পুরাতন শাখা শুষ্ক হয়ে যায়, আবার নবীন শাখা জন্মায়। এই বৃক্ষ ভারতে দেখা যায় না।**

সমস্ত পৃথিবী গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ—সংযুক্তার সেই কথাগুলি—আমরা নারী, আমরা সরোবরের মতন : তোমরা পুরুষ রাজহংসের মত, সাঁতার দিয়ে চলেছ। নারীর হৃদয় সরোবর থেকে দূরে সরে গেলে পুরুষের আর কি অবশিষ্ট থাকে ?

বন্ধু, তোমার পত্র আমাকে অভিভূত করেছে। আমার শির আমি তোমার কাছে অবনত করলাম। আমার মস্তকে এক আশীর্ব্বাদের মুকুট শোভা পেয়েছে। সে শোভায় গৌরবান্বিত হয়ে আমি মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে চলে এলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে হ'ল আমার বিজয় অভিযান। আমি আমার শিবিকার অভ্যন্তরে বসেছিলাম—দুই পাশে বাদামী রঙের ঝালর দুইটি উটের দুপাশে ঝুলে পড়েছে। কি সুন্দর মন্থরগতি ছিল সে উষ্ট্রযুগলের! সেদিন বিহঙ্গম আমারই জন্য গান গেয়েছিল, হরিণ শিশুগুলি সুন্দর গ্রীবা ভঙ্গি করে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। অন্তরীক্ষে, ভূমিতে সবই যেন আমার আনন্দে উল্লসিত। পথের পার্শ্বে চলেছে ক্যাকৃটাস বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষশীর্ষে শোভা পাচ্ছিল রক্ত কোরক। সম্মুখে বেলাবিহীন সমুদ্রের মত পড়েছিল বিরাট ভূখণ্ড। সবুজ বসন্তে বনের উপরে সুনীল আকাশ অবনত হয়ে স্বর্ণাভ উর্ণনাভের জাল বুনেছিল।

ঐ দূরে বনচ্ছায়ে আমি যদি একটি হাজার মিনার সমন্বিত প্রাসাদ রচনা করে দিতে পারতাম—সেই সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম একটি 'পামিরা' খর্জ্জুর বৃক্ষের বনপথ—সীমাহীন অনন্তের দিকে।

মনে পড়ে একদিন আমরা চাঁদনীচকের মধ্যে দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, তখন দরবারের সময় উপস্থিত। পথপার্শ্বে বিটপী বীথির মধ্যে দিয়ে চলেছে উৎসবের পোষাকপরিহিত একদল লোক এবং সঙ্গে সুসজ্জিত বলীবর্দ্দ ও করীযূথ। বাতাসে ভেসে চলেছে কস্তুরী জাফরাণ গন্ধ, অগুরু চন্দনের সুবাস ; পথপার্শ্বে বিপণিতে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল অলঙ্কাররাজি ;

পশুগ্রীবাবিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি ; পথচারিণী নারীর মণিবন্ধ ও বাহুর কাংস্য অলঙ্কারের নিক্কণ কর্ণে প্রবেশ করছে ; বিচিত্র বর্ণের ঘুড়ি শূন্যে উড়ে চলেছে, অবগুণ্ঠিতা নারীর দল পাশাপাশি অলিন্দে দাঁড়িয়েছে—তাদের নয়নের কৃষ্ণমণি অঙ্গের হীরক ও নীলকান্তমণির উজ্জ্বলতা অতিক্রম করে গেছে।

এমন আনন্দের দিন কি কখনো আমার জীবনে এসেছে ; দরিদ্রতম পথিকও আজ আনন্দমুখর। দরিদ্রের চেয়ে আমাদের কি বেশী সম্পদ আছে ? নারীর মস্তকে সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত ঐ জলপূর্ণ তাম্রকলস সম্রাটের মুকুটের শুভ্রমণিখণ্ডের চেয়েও সমুজ্জ্বল। নারীদের শুভ্র দন্তরাজি আমার কণ্ঠের মুক্তাহারের মত শুভ্র।

শাহজাহানাবাদ অপরূপ নগর। এইখানে আমি নির্ম্মাণ করব একটি বৃহৎ সুন্দর পান্থনিবাস—তার তুলনীয় কোন পান্থশালা হিন্দুস্থানে থাকবে না। পথিক এখানে এসে দেহ মনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে—আমার নাম হিন্দুস্থানে চিরন্তন হয়ে থাকবে। আমি দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেব আমার সমস্ত ধনসম্পদ।

বিরামহীন চিন্তাস্রোত চলেছে আমার মনে মনে—আমি রাজপ্রাসাদের প্রান্তে এসে উষ্ট্র থামিয়ে দিলাম। সূর্য্য যখন আলো বিতরণ করে—অসংখ্য অণু তখন মনুষ্য চোখে ধরা দেয়। এখানে চাঁদনীচকের মত বিসর্পিল বিপণিতে এসেছে অসংখ্য লোক—সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে, এখানেই বিভিন্ন পথ এসে মিশে গেছে। ঐ দেখ, মানুষ এসেছে জাঞ্জিবার, সিরিয়া, ইংলণ্ড, হোলাণ্ড, তুরস্ক, খোরাসান, জাবুলিস্থান, চীন, কাবুল, তুর্কীস্থান থেকে ; আরও অনেক দেশের লোক। ফলের দোকান—ডালিম, কুল, তরমুজ, আঙ্গুরে ভরে গেছে। আজকের দিনের সুখ-স্বাদের জন্য মানুষ যে কোন মূল্য দিতে পারে। ফুলের দোকান দেখে মনে হয় উদ্যান রচনা করা হয়েছে—সহস্র পাত্র থেকে যেন ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে।

উচ্চকণ্ঠে ঐ ভোজনালয়ে তৈরী হয়েছে সুগন্ধি মশল্লার ভোজ্য।—ঐখানে বিক্রেতা তার জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে। সমস্ত স্থানেই মানুষের কলরোল, বিভিন্ন শব্দ যেন একটিমাত্র কবিতার বিভিন্ন চরণ। ঐ দেখ, বসে আছে ভাগ্যগণক—তাদের সম্মুখে রয়েছে বিভিন্ন ভাগ্যচক্র, জন্মকুণ্ডলী। ঐ দেখ, গণক রাশিচক্র আঁকছে—শঙ্কাকুল নারীকে ভাগ্যফল বলে দিচ্ছে—তারা তাদের কপালের লিখন পাঠ শেষ করে জনতার মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ওগো তরুণ নক্ষত্রের ভাষাবিদ্! বল ত, আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে? আমার জন্য আনন্দক্ষণ কি আসবে না? ঐ আকাশের আঁখি কি আমার জন্য কেবল দুঃখেরই ইঙ্গিত করেছে?

ঐ দেখ, চলেছে আমীর, মনসবদার রাজ দরবারের দিকে। তাদের সঙ্গে চলেছে অসংখ্য অনুচর। কি অপরূপ তাদের সৈন্যদল! অস্ত্রের ঝঙ্কার যেন যুদ্ধের শব্দহীন সঙ্গীত। দেওয়ান-ই-আমের দিকে আরও কত লোক চলেছে, শিবিকার রেশমী আবরণের অন্তরালে উজ্জ্বলবেশা নর্ত্তকীরা দৃষ্টিপথে পড়ছে। ঐ চলেছে কৃষ্ণরেখাঙ্কিত হস্তীযূথ—গলায় রূপোর ঘণ্টা, কাণের পাশে দুলছে তিব্বতের চামর, তাদের পার্শ্বে রয়েছে ছোট ছোট হস্তীশিশু—যেন তারা রাজ-অনুচর। আমি যেন আমার চোখের উপর দেখছি সেই দৃশ্য।

তারপর আসছে চিতাবাঘ—তার পশ্চাতে চলেছে বাঙ্গালার বাঘ। তারা যে বনরাজ্যের রাজদূত। তারপর চলেছে শিকারী বাজপাখী—ওরা শূন্যরাজ্যের রাজদূত। সকলের শেষে রয়েছে উজবেগ দেশের কুকুর—বড় বড় পশুগুলির পাশে দুলছে ক্ষুদ্র পতাকা।—শিঙার শব্দ শুনছি! কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হরিণের দল।

এমনি ভেসে চলেছে কত সুন্দর ছবি—আমার চোখের উপর, কিন্তু একটিমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে—আমার

প্রিয়তম যুদ্ধান্তে অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে আসবেন—আমাকে এখানে তিনি দেখবেন—আমাকে তিনি অভিনন্দন জানাবেন······

সত্যি তিনি এসেছিলেন, তাঁর যুদ্ধের অশ্ব তখনও ভূমি স্পর্শ করেনি। কিন্তু অশ্বারোহী মর্ম্মর পুতুলের মতন বসে আছেন—ভীষণ-দর্শন অথচ কোমল। চারণের সঙ্গীতের উন্মাদনায় তিনি কি তাঁর অশ্বকে পরিচালিত করে আসতে পারেন না? আমি আর কি তাঁর হস্ত কখনো স্পর্শ করতেও পাব না? আমার বহুমূল্য মুক্তাহার কণ্ঠ থেকে খুলে ফেল্লাম—তারপর গজমতির পাতায় কয়েকটি অক্ষর খোদিত করে প্রিয়তমের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। প্রিয়তম আমাকে অভিবাদন জানিয়েছেন—আরও বিনম্র অভিজাত ভঙ্গীতে বুকের উপর তিনি হস্ত স্থাপিত করে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলেন। তার পর মুহূর্ত্তে অশ্বকে কষাঘাত করে বর্শা বাহিনীর পশ্চাতে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

কিছুদিন আমার কাটল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে—আমি অতীতকে ফিরে পেলাম—কিন্তু এবার নূতন আবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে—নূতন আলোর মাঝে। আমি দেখেছি আমার উদ্যান-বাটিকার পাশ দিয়ে যমুনার জলধারা আর বয়ে চলে না, ঐ দূর নীল গগনের সীমা রেখান্তে তৈরী হয়েছে আমার নূতন উদ্যান। আমার সম্মানে নির্ম্মাণ করেছিলেন সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর মর্ম্মর মসজিদ্। আজ স্বর্য্যের আলোরেখার সঙ্গে মিশে গেছে আমার সেই মস্‌জিদের ভগ্ন প্রাঙ্গণ।

নীরবতা! শোন, এবার তোমায় বলব আমার এক স্মরণীয় কাহিনী। গোয়ালিয়র নিবাসিনী নর্ত্তকী গুলরুখ-বাই আমার নয়নের আনন্দের জন্য এক নূতন নৃত্য আবিষ্কার করেছিল। সেদিন তার সূক্ষ্ম ওড়নার অঞ্চলকে সে গুজরাটের আতর দিয়ে সুগন্ধি করে নিয়েছিল। ওড়নার ঝালরের মধ্যে সে বাদাম ফুলের চুম্‌কী বসিয়েছিল—আমার প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার পরেছিল—গুলরুখ যে আমার অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ কি মৃত্যুর আভাসে

দিব্যদৃষ্টি লাভ করে? নৃত্যের অবসরে হরিণীর মত সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—গুলরুখ অতি মৃদুকণ্ঠে পুরাতন সঙ্গীতের চরণ গেয়েছিল, সে সঙ্গীতের রেশ আজও আমার কানে শোকগীতির মতন ঝঙ্কৃত হচ্ছে :—

ফুটেছিল আমার প্রাঙ্গণে রজনীগন্ধা
ঝরেছিল সুবাসের নব অলকনন্দা।
প্রিয়তম, ভূস্বর্গের প্রাসাদে চলে গেলে তুমি ;
আকাশের মেঘ এসেছিল তব চরণ চুমি।
লিপি পাঠায়েছি তোমারে, আসেনি উত্তর,
তবু আশা মোর প্রাণে জেগেছিল নিরন্তর।
আমার উদ্যানে ফুটেছে আজি কত শত ফুল,
এখনো শয্যা মোর তোমার গন্ধে রয়েছে আকুল।

নৃত্যশেষে গুলরুখ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। আমি সুদীর্ঘ অলিন্দ অতিক্রম করে তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম—তাকে আমার ধন্যবাদ জানাতে। প্রাচীর পার্শ্বে ছিল লাল নীল আলোর প্রদীপ—প্রদীপের বুকে জ্বলছিল অগ্নিশিখা। বাতাসে আন্দোলিত হয়ে তার সূক্ষ্ম ওড়নার অঞ্চল একটি আলোর শিখা স্পর্শ করল। মুহূর্তের মধ্যে আমার গুলরুখ—আমার মুখের রক্তিমার মত গুলরুখ—অগ্নিপরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল, ভীত আর্ত্ত হয়ে গুলরুখ ছুটে পালাল—যেমন করে পালায় বনের হরিণী দাবানলের ক্ষণে। আমিও ছুটে চল্লাম, এবার আমরা এসে পড়লাম মহলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। আমার বসন-অঞ্চল ছুঁড়ে দিলাম তার অগ্নিশিখার উপরে—আমার সূক্ষ্ম মসৃণ বসন মুহূর্ত্তের মধ্যে অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠল—আমরা দু'জনে আগুনের মধ্যে দাঁড়ালাম।

তখন দরবার-ই-খাসের অধিবেশন চলছিল। চীৎকার করে ডাকলে হয়ত কেউ আসবে আমাদের সাহায্যে। কিন্তু কে আসবে? আমার

প্রিয়তম দরবারে ছিলেন—আমার বিপর্য্যস্ত বসনাবৃত শরীর তাঁর দৃষ্টিপথে আসবে কি ? তিনি কি আমাকে স্পর্শ করবেন ? না—তাঁর চক্ষুর সম্মুখে অন্য কোন মানুষের হস্ত আমাকে স্পর্শ করবে—আর তিনি হবেন শুধু সেই অসহায় দৃশ্যের নীরব সাক্ষী ? আমার লজ্জায় আমি রক্তিম হয়ে গেলাম—সে রক্তিমা অগ্নিশিখার চেয়েও উষ্ণ, আমি কিন্তু তবু নীরবই রয়ে গেলাম।

সেদিন আমার শরীর দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক দিন শয্যাশায়িনী ছিলাম। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার প্রিয়তম দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। প্রিয়তম আমাকে আমার রাখীর প্রতিদানে একটি 'কাঁচুলী' (২৪) পাঠিয়েছিলেন। সেই সোনালী কাঁচুলীর প্রচ্ছদ ভাগ ছিল—ঘন লাল রেশম দিয়ে তৈরী, পদ্মরাগ মণি মুক্তা হীরা খচিত, প্রবাল-জড়িত। সুতরাং সে দানের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি তাঁকে পত্র লিখেছিলাম—আমার রাখীবন্ধ ভাই যদি তাঁর ভগ্নীর প্রতি অনুগ্রহ করে গজদন্তের উপর খচিত ছবি তাঁর ভগ্নীকে উপহার দেন, তবে তাঁর ভগ্নীর খুব আনন্দিত হবেন। সম্রাট শাহজাহানও জানলেন যে, তাঁর কন্যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্ত বন্ধুর নিকট পত্র প্রেরণ করেছে। তিনিও লিখলেন একটি প্রয়োজনীয় পত্র—সে পত্র পাঠিয়েছিলেন ছদ্মবেশী দূতের হাত দিয়ে আরঙ্গজেবের শিবিরে।

দিন গেল—অনেক দিন, তারপর এল পত্রের উত্তর। আমি পত্র খুলে দেখলাম—শিথিল হস্তলিপি, আমি পত্র পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—হিমালয় স্থান পরিবর্ত্তন করেছে! পশ্চিম গগনে সূর্য্য উঠেছে! কোন প্রেত কি আমার প্রিয়তমকে আশ্রয় করেছে? পত্রখানি ক্ষুদ্র কিন্তু খুব বীরত্বব্যঞ্জক—হিমশীতল তার সুর! সে পত্র আমার অন্তরের মধ্যে আমার

(২৪) বেগম নুরজাহান প্রথম ভারতবর্ষে নারীদের জন্য "কাঁচুলী" (বডিসের মত) জামা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি "বাদলকিনারী" ওড়না, খাবার টেবিলের "দস্তরখান" চাদর) ব্যবহার আরম্ভ করেন এবং আতরের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন।

জীবনের গতি স্তব্ধ করে দিল! সমস্ত দিবারাত্রি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদনে উনি কি এতই ব্যস্ত যে তাঁর মনের মতন করে তাঁর অন্তরের কথাগুলি সাজাবার সময়ও নেই! শেষ ছত্রে লেখা ছিল ঃ

"মুঘল রাজকুমারীর আলেক্ষ্য সংগ্রহের মধ্যে চৌহান রাজপুত্রের চিত্রপট শোভা পেতে পারে না।"

আমার সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। 'খোরাসানের অশ্রু' কাব্যে কবি আনোয়ার লিখেছিলেন ঃ—

স্থরু হল মোর চিঠি অন্তরের বেদনা লইয়া,
শেষ হল চিঠি মোর অন্তরেরে আঘাত করিয়া।

এক্ষণে আমার মনে হচ্ছে যেন আমার একটি খনি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। কারো কাছে আমার কোন নিন্দা শুনেছেন না কি? কেন তিনি সেই নিন্দা বিশ্বাস করেছেন? প্রিয়তম, যদি সহস্র সাধু এসে আমায় বলত—তোমার বিরুদ্ধে, আমি বিশ্বাস করতাম না কিছুই—যতক্ষণ না তোমার মুখে শুনতাম সে কথা। আওরঙ্গজেব আর ভগ্না রোশেনারার মুখে তুমি কিছু শুনেছ কি? তারা যে দারার শত্রু—আমার শত্রু। আমরা কি সেই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় হারিয়েছি—সে আশ্রয় ত চৌহান বংশ; বুন্দির রাজবংশ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বংশ। তোমার নামে কোন কলঙ্ক নাই, তোমার কল্যাণ দৃষ্টিতে সমস্ত আপদ দূরে যায়।

অমনি করে আমি শত শত প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কোন উত্তরই পেলাম না। আমি আমার করপল্লব দংশন করলাম। আমার মনে পড়ে কৃষ্ণ-মেঘের ডম্বরুধ্বনি—সে ধ্বনিতে ছিল সহস্র দামামার রুদ্ধ সুর। আকাশে কি কোন শ্মশানযাত্রার কলরোল উঠেছে? কোন স্বর্গ-শিশুর মৃত্যু হয়েছে কি? ঐ দেখ, মুষলধারে বারিপাত হচ্ছে। তারপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—বিদ্যুৎশিখা কৃষ্ণ মেঘখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল, আমি বিরাট

ছেদচিহ্ন দেখতে পেলাম, আমার দুঃখের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটা শব্দ আসছে—সে শব্দ অতলস্পর্শী……

নৃত্য চলেছে সেই অতলস্পর্শী তল ভেদ করে। আমার মহলে রাত্রির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শত প্রদীপ জ্বলে উঠল—আমার প্রকোষ্ঠে স্বর্ণখচিত যবনিকা প্রসারিত হয়েছে ; বাঁশী, বীণা, করতালের রোল সমস্ত রজনী ব্যাপী চলেছে। সমস্ত জিনিষই কি ভগবানের দান নয়—এই অসহনীয় দুঃখ, তাঁরই দান ? এই ত' প্রমাণ করছি যে আমি ভগবানকে পরিত্যাগ করেও বাঁচতে পারি। বাদ্যকরদের আদেশ দিলাম—আরো ঝড়ের গতিতে বাদ্য চলুক। ব্যাঘ্রের মত দ্রুত পদক্ষেপে আমি ছন্দহীন গতিতে চলেছি আমার চিন্তার মধ্যে ছিল এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব। করতালের ধ্বনি শান্ত হয়ে গেল—ঝঙ্কারের রেশ তখনও ভেসে আসছিল। আমি নিশা ভ্রমণকারীর মতন আমার অগোচরে গালিচা অতিক্রম করে চলে এলাম আমি ফিরোজশাহ্-পয়োধারার কল-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—আর কিছু নয়

আমি চলেছি—চলেছি, হঠাৎ আমি শিলাতলে নিজের দেহ বিস্তৃত করে দিলাম—আমি নিস্পন্দ ; কে যেন এসে আমাকে তুলে নিল আমার বুকের ভিতর আমার হৃদয় কাচখণ্ডের মত চূর্ণ হয়ে গেল।

তোমায় আমি লিখেছিলেম অনেক পত্র
ফিরে ত আসেনি আজও একটি ছত্র
আজ নিশীথে ফুটেছে রজনীগন্ধা আমার বনে,
ছড়িয়ে গেছে গন্ধ তাহার আমার দেহে মনে।

একদিন দরবারে খুব বড় কোলাহল উঠল। ছুলেরার জন্য ভাবব বিপুলস্কন্দ ক্ষীণকটি ছুলেরার জন্য ভাবব? সে যে এক নর্ত্তকীর সন্তান (২৫) তার জন্য আমার কি আসে যায় ? তার "বসন্ত-সঙ্গীত" আর "বর্ষার-সুর"

(২৫) জনশ্রুতি ছিল ছত্রশালের মাতা প্রথম জীবনে নর্ত্তকী ছিলেন, একথা অবশ্য সত্য নয়। শত্রুর নিন্দা মাত্র। অবশ্য ছত্রশালের ছিল অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রীতি ও জ্ঞান।

তার হরিণ নয়ন আমাকে একদা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। শাহজাহানের প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা যা ইচ্ছা সবই করতে পারে। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে কার এমন ক্ষমতা আছে যে, সম্রাটকুমারী জাহানারার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করে? সুতরাং দিল্লীর শ্রেষ্ঠ গায়ককে আমার কৃপাদান করে কৃতার্থ করলাম—তাকে দরবারের ভূষণে ভূষিত করলাম। মুঘল রাজকুমারী আজ হিন্দুস্থানের দীনতম সন্তানকে সেই জিনিষ দিল যা ভারতের বরেণ্যতম সন্তান প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি আর ভাবতে পারছি না! উঃ কি নির্ম্মম! পৃথিবীর নিশ্বাস কি উষ্ণ!

একদিন আমার অনুগৃহীত গায়ক অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী নিয়ে পতাকা উড়িয়ে প্রাসাদে এসেছিল। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি মহবৎখানের সঙ্গে। মহবৎখান রাণা প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী। মহবৎখান দরবারের দিকে আসছিলেন। আমীর মহবৎখানের অনুচরের সঙ্গে পথে গায়কের অনুচরের আরম্ভ হ'ল কলহ—মহবৎখান যুবরাজ দারার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবার এই নূতন ব্যাপারে আমার উপর রুষ্ট হলেন। শিশোদীয় বংশাবতংস মহবৎখান দরবারে প্রবেশ করলেন—তাঁর কোন পতাকা ছিল না। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, "পতাকা কোথায়?" মহবৎ উত্তর দিলেন, "প্রয়োজন নাই। কারণ গায়ক দরবারে পতাকা নিয়ে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে, সুতরাং আমীরের পতাকার প্রয়োজন নেই।" সম্রাট আদেশ দিলেন, "গায়কের পতাকারও প্রয়োজন নাই।" আমি বুঝলাম, রাজদরবারে আমাদের শত্রু অনেক, আওরঙ্গজেবের মিত্র অসংখ্য। যুবরাজ দারা ছিলেন স্বভাবতঃ গর্ব্বিতমনা, তাঁর ব্যঙ্গোক্তিগুলি অনেক সময়ই মহৎ লোকের সম্মান রেখে চলতে জানত না। আর সম্রাট শাহজাহান ছিলেন বিশেষ ভাবে অন্তঃপুর-বিলাসী

ষষ্ঠ স্তবক

(কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি)

*　　*　　*　　*

আর একদিন দুলেরা রাজপ্রাসাদে আসছিলেন, সেদিনও মহবৎখানও দরবারে এসেছিলেন। তাঁদের সাক্ষাৎ হল, মহবৎখান বিরূপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দুলেরাকে বল্লেন, "একজন সামান্য গায়ক! তার কি প্রয়োজন ছিল পতাকা আর অনুচরের? যখন একজন মহাজন ব্যক্তি পথে হেঁটে চলে, মানুষ পথ ছেড়ে দেয়, কিন্তু দিল্লীর গায়কের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে!"

শুনে লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে পড়ল—আমি আমার অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলাম। অতি দীন ভিক্ষুণীর মতন আমি নিভৃত গৃহ কোণে নিজেকে লুকিয়ে ফেল্লাম। আমিও একদিন আমার পিতা, সম্রাট শাহজাহানের নয়নমণি ছিলাম, নূরজাহান আর তাজ বেগমের মতই আমি সাম্রাজ্য শাসন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু আমার নিষাদ-রাজ নলের মতন অথবা অযোধ্যার রাজকুমার রামের মতন স্বামী ছিল না। আমার ছিল প্রিয়তম; তাঁর আভিজাত্য ছিল বাদশাবেগমের ঐশ্বর্য্যের ম্লানদীপ্তি।

আমি আমার বসন ছিন্ন করে ফেললাম। আমার সহোদর দারাও রাণাদিলকে ভালবেসেছিলেন, রাণাদিল ছিল দিল্লীর বিপণিতে পথচারিণী নর্ত্তকী; সম্রাট শাহজাহান দারার সঙ্গে রাণাদিলের বিবাহের সম্মতি দিয়েছিলেন। রাণাদিল সম্রাট আকবরের প্রপৌত্রী (২৬) নাদিরা বেগমের সপত্নী হবার অধিকার পেয়েছিলেন। রাণাদিলের শিবিকা রাজপথে কখনো অবরোধ করা হয় নি, কারণ দারা তাকে ভালবাসতেন।

(২৬) নাদিরা বেগম ছিলেন জাহাঙ্গীর পুত্র পরভেজের কন্যা এবং দারার পত্নী।

শোকার্ত্ত গৃহতলে বসে আমি কেবল আকাশ পাতাল ভাবছি—চিন্তার শেষ নেই। অভিমানিনি জাহানারা বেগম! তোমার প্রাণ যদি উপবাসী না হ'ত···লজ্জাশীলা জাহানারা, যদি আজ তুমি ক্ষোভে অভিমানে তোমার গায়ককে পৃথিবীর চক্ষে সম্মানিত করবার চেষ্টা না করতে······আমার বিক্ষিপ্ত বসনাঞ্চল কুড়িয়ে নিয়ে গবাক্ষের সম্মুখে অগ্রসর হলাম।

আমি দেখছি—উদ্যানের মালাকার চলেছে দিনের কাজের শেষে সাইপ্রাস বীথির পাশ দিয়ে গৃহের পানে। তার একমাত্র পত্নী আজ তার প্রথম পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে! কি গৌরব আজ এই নারীর! এই সামান্যা নারীরও একটি রাজ্য আছে—সে রাজ্যে আছে অজস্র ফুলফল, তার স্বামী আছে তার প্রিয়তম; তার সন্তান আছে—সে যে তার ভবিষ্যতের আশা।

কি দীন এই দুঃখিনী বাদশা বেগম! তার বিবাহ-বসন আজ শতধা ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমার চোখ বেয়ে ঝরছে অজস্র অশ্রুবন্যা। আমি মনশ্চক্ষে এক দৃশ্য দেখছি—উর্দ্ধে নীল আকাশ নক্ষত্রখচিত, আমার বিবাহ বাসরের চন্দ্রাতপ, এক অশরীরী বর এসেছে আমার। মৃদু বাতাস আমার মুখ চুম্বন করছে—বলছে, ওগো তোমার প্রিয়তম আসছে। বহুদূর থেকে সঙ্গীতের রেশ ভেসে এসে বলছে আর্দ্র মৃদুস্বরে—ওগো, তোমার প্রিয়তম আসছে। সমুদ্রতলে শুক্তি মুক্তার নীরব সঙ্গীতের মত একটা ধ্বনি আমার কানে আসছে—এই সঙ্গীত যে পৃথিবীর প্রথম অভিজ্ঞতা।

স্থান কাল আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রাচীর-গাত্রে গবাক্ষের উপরে আমার মস্তক অবনত করলাম, আকাশে তারার দিকে নিবদ্ধ ছিল আমার দৃষ্টি, কখন নিদ্রা এসে শান্তি দিল জানি না।

বেগম নূরজাহানের জেসেমিন প্রাসাদে আমার কক্ষে বসেছিলাম—বর্ষার শ্রান্তিহীন বর্ষণ চলেছে, সীমাহীন ধূসর আকাশে মেঘখণ্ড অবগুণ্ঠনের

স্রোতের মত— বন্যাধারা যেন মানুষের দৃষ্টির পথ থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত জীবনীশক্তি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঐ দেখ আবরণ মুক্ত হ'ল, প্রাসাদের অন্তর ভেদ করে একটা গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ছুটে চলেছে। বাতাসের সুর ছিল করুণ শোকার্ত্ত, তারপর সেই সুর হ'ল তীব্র, অবশেষে আর্ত্তনাদ করে সুর চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে। আমি দেখছি যমুনার জলতরঙ্গ আবর্ত্তের বেগে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে ; ঝঞ্ঝার বেগে আসছে আমার একটি অতীত স্মৃতি।

বল্কের রাজবংশের সন্তান নজবৎ খান ; তার ছিল বীরত্বের খ্যাতি। যখন সম্রাট শাহজাহানের অন্তপুরের জীবনের সীমা দীর্ঘতর হতে লাগল, তার সঙ্গে দেওয়ান-ই-আমে তাঁর সমস্ত সভার অধিবেশনও হ্রস্বতর হতে লাগল। আমিই তখন সম্রাটের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজকার্য্য আলোচনা করতাম। এমন কি নজবৎ খানের সঙ্গেও আমি রাজকার্য্য আলোচনা করেছি—বল্কের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাপারেও তার সঙ্গে আলোচনা করেছি।

আজকের মতন আর একদিনের শাহজাহানাবাদের কথা মনে পড়ছে। আমি জুম্মা মসজিদ থেকে শিবিকায় আমার প্রাসাদে ফিরে এসেছি। আমি প্রার্থনা কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলাম—পারিনি। আমি ভিক্ষা দান করেছিলাম, সে ভিক্ষা ধূলিতে পরিণত হয়েছিল। আমার অন্তর অশান্ত, শূন্য—তাই আমার হস্তের দানের মধ্যে ছিল না আশীর্ব্বাদ।

আমার উদ্যানে লতাগুল্মের অন্তরালে অনেক গোলাপ ফুটেছিল, কয়েকটি পদ্মের মৃণাল ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি আমার শয্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু বিশ্রাম পাইনি। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, একখণ্ড শীতল পাষাণে যদি মাথা দিয়ে শুতে পারতাম ! পৃথিবীর সমস্ত আলো কি আজ চিরতরে নিভে গেছে ? আমি বাহিরে পথের উপর অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনলাম। আমার সহোদর দারা অশ্বপৃষ্ঠে আসছিলেন। তরুণ যুবকের মত

উদ্ভাসিত মুখে দারা আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—সমস্ত শরীর দিয়ে জলধারা বেয়ে পড়ছিল। আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি নজবৎ খানকে বিবাহ করব কি? সম্রাটও বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত—তাঁর অসম্মতি দেওয়ার অবসর কোথায়?

অল্প দিনের মধ্যেই দারা সিংহাসনে আরোহণ করবেন। নজবৎ খানই হবে রাষ্ট্রের প্রধান আশ্রয়। যুবরাজ দারা বল্লেন, আজ রাত্রেই সম্রাটের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করবেন। আমি দেখলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বীর সেনাপতি—যেন বিশাল বনানীর অভ্যন্তরে বৃক্ষরাজির মধ্যে উন্নততম বৃক্ষটি। রাজ রক্তের চিহ্নটি তাঁর সমস্ত দেহে উদ্ভাসিত। তারপর দেখলাম, দুলেরার কমনীয় কান্তি, মুখে সঙ্কিত হাসি; সেই জন্যই দুলেরা আমার অতপ্রিয়—সে হাসি অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গীত ভেসে আসত, বাতাসে যেমন আসে সূর্য্যালোকে নৃত্যের ছন্দ।

জীবনে অনেক খেলা খেলেছি, খেলায় আর রুচি নাই; আমি যদি কোন বিরাট রাজবংশকে আশ্রয় করি—জাহানারা বেগমের গৌরব-বিটপী কি ছায়াবিহীন?

আমি আমার সহোদরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম— নিরুত্তর; তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

"আমি নজবতের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করব আজ সন্ধ্যায় পিতার কাছে···"—বলেই দারা চলে গেলেন উত্তরের অপেক্ষা না করে।

সন্ধ্যা সমাগত, আমি আপাদমস্তক ঘনকৃষ্ণ বোরখার আবরণে ঢেকে লোকচক্ষুর অগোচরে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি হায়াৎ-বকস বাগের (২৭) মধ্যে দিয়ে পথ অতিক্রম করছি। অমরাবতীর

(২৭) হায়াৎ বক্স বাগ অর্থাৎ প্রাণদায়িনী উদ্যান। ফুলের জন্য বিখ্যাত, সেখানে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল। প্রত্যেক ফোয়ারা বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরমণ্ডিত ছিল।

দেশে নন্দনকাননের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছি—আজকের মতন অমন ফুলের উৎসব কোন দিন দেখিনি। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখার উজ্জ্বলতায় বর্ষণমুখর মেঘখণ্ডগুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রক্ত আলোর শিখা মর্ম্মর প্রাসাদ ও শিলাতলকে অপরূপ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করেছে। নীললোহিতের আভার মধ্যে ফুটে উঠেছে রক্তমুখা কুসুম-পল্লব ; কলাবতী রক্ত আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। রাশি রাশি গোলাপ অন্তরের আগুনে রক্তিম হয়ে উঠেছে :—গোলাপ তার সুবাস ছড়িয়ে দিনের দেবতার শেষ পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিল। অস্ত সূর্য্যের ম্লান রশ্মিকে স্পর্শ করার জন্য নদীর জল আকুল আবেগে হাত তুলে ইঙ্গিত করছে। সুবর্ণমণ্ডিত শিবির শীর্ষে জলকণা নীল আকাশের প্রচ্ছদপটে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আলো আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, মদির গন্ধ আমাকে অচেতন করে দিয়েছে—আমি ত্রস্তপদে কমলালেবুর বাগিচায় প্রবেশ করলাম। ছায়ার অন্তরালে প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসলাম। তীব্র জ্বালার দহনে আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেল্লাম। আমি হব নজবৎ খানের পরিণীতা ! সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আমি যাকে ভালবাসি না, তার আদেশ বহন করে বেড়াব ?……এখনো আমার মনে পড়ে তার কুটিল দৃষ্টি—যখন সে বল্ক রাজ্যের কথা বলছিল। আমার মনে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সে যেন দুটি বিভিন্ন সুরে কথা বলেছিল—এক শান্ত মিষ্ট কণ্ঠ, অন্যটি গম্ভীর ভয়ার্ত্ত। নজবৎ খান বলেছিল—"যদি আমি বল্কের অধীশ্বর হই…তখন রাজকুমারী হবেন…" আমার মনে নূতন স্রোত বয়ে গেল মুহূর্ত্তের জন্য, হাঁ রাজকুমারী জাহানারা হবে নজবতের …? ভাবলাম অনেক কিছু।

কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি সবুজ। বর্ণ সমাবেশে জলকণা বিভিন্ন বর্ণ পরিগ্রহ ক'রে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হ'ত। গ্রীষ্মে পুরনারীরা এই উদ্যানে ভ্রমণ করে ক্লান্তি অপনোদন করতেন।

দেওয়ান-ই-আম থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছিল, একটি বিরাট ঢেউএর মতন সঙ্গীতের সুর ভেসে এল—সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন ভেসে চলেছি। আমি আনন্দ রথে উর্দ্ধে আকাশে উঠলাম, তারপরে নিমজ্জিত হলাম দুঃখে উপত্যকায়। একটি ধ্বনি সমস্ত শূন্যকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল, আমাকে যেন ছুরিকার আঘাতে বিদ্ধ করল। সে ব্যথাও আমার অচেনা নয়। এই ব্যথা আমি আর একবার অনুভব করেছিলাম, যে দিন আমি রাখীবন্ধ ভাইয়ের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম—আর কোন দিন করিনি ; অন্ততঃ সেরূপ অনুভব করিনি।

আমার মনে হল—কে যেন একজন কথা বলছে, আর সকলেই ক্রন্দন করছিল। যে কথা বলছিল—সে যেন স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন। আমার প্রদত্ত রাখীর কোন প্রয়োজন আছে কি তাঁর কাছে ? সে রাখি হয়ত আজ অন্য কোন বাহুকে বেষ্টন করে আছে। আমি প্রাচীন মসজিদে বসে যে পত্র পড়ছিলাম—তার অর্থ কি ?—মনে পড়ছে তখন একটি অজ্ঞাতনামা পাখী অশুভ ধ্বনি করছিল—প্রাচীরের উপরে বসে। আমি কিন্তু তৃপ্ত ছিলাম—আমার জীবন তখন আনন্দের সঙ্গীতে সুর দিচ্ছিল। আমার সমস্ত দেহ মন পুষ্পোদ্যান হয়ে উঠেছিল।

আমি আকাশের দিকে বাহুদ্বন প্রসারিত করলাম—দুটি বাহুর মধ্যে কি বিরাট শূন্যতা! আমার হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবার মতন কোন বস্তুই পেলাম না, আমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার মত কোন কিছু হৃদয়ে রাখতে পারলাম না। মাতা সন্তানের জন্য ত্যাগ করে, তাতে তার আনন্দ ; সে ত্যাগ যদি নিষ্ফল হয়, তবে সে ত্যাগ হয়ে উঠে বিরাট ভার।

...পতিবিহীনা নারীর জীবন, সূর্য্যবিহীন দিবস...।

দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গীত উদ্দাম হয়ে উঠল। আমার হৃদয়ও

উদ্দামতর হয়ে উঠল। মনুষ্যত্বের অপমানকারী আওরঙ্গজেবের অধীনে যে রাজ্য চালনা করে, তার নিকট সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রধারার মূল্য কি ?—কোন মূল্যই নাই। সত্যি কি চৌহান কুলতিলক—মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের মহিমা ভুলে গেছেন, যেমন তিনি আমাকে ভুলে গেছেন—আমাকে ত্যাগ করেছেন ? তিনি ত' আমাকে তাঁর "সংযুক্তা" নামে সম্বোধন করেছিলেন…?

গম্ভীর শোকোচ্ছ্বাস আমার মন ভরে দিল, বাঁশীর করুণতান, করতালের কলরোল—সম্মিলিত সুরে আমার কর্ণকুহর রুদ্ধ করে দিল। ঐ দূরে দিকচক্রবালে সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা। মনে হল, এক রক্ত-রঞ্জিত বিরাট বস্ত্রখণ্ড সমস্ত আকাশ জুড়ে রয়েছে।

আমার ভ্রাতার দেওয়ান-ই-খাস থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হয়েছে ; আমি একটি গোপন পথে আমার মহলের পার্শ্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। যথা সম্ভব শীঘ্র আমার অদৃষ্টের বিধান শোনবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম—তাই সেখানে গিয়েছিলাম। হয়ত বা শেষ সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে বাধা দিলে একটা ব্যবস্থা হলেও হতে পারে।

দেওয়ান-ই-খাসের পথে শুনলাম একটা শব্দ। আমি দুজন মানুষ দেখলাম—একজনের মস্তকে স্বল্প হরিদ্রাভ উষ্ণীষ—পরিধানে রাজদত্ত ভূষণ, ঘন কৃষ্ণ ঝালর ঝুলে পড়েছে। কূপের গভীর প্রদেশ থেকে উত্থিত শব্দের মতন ঝঙ্কার দিয়ে সে মানুষটি কথা বলছিল! বৃক্ষপত্রের অন্তরালে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম—নজবৎখান।

লোক দু'জন শিলাতল অতিক্রম করে দাঁড়াল, অর্দ্ধ-স্বগতভাবে বলছিল:—"মনে হয় যেন শাহজাদা দারা ভাব্‌ছেন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তাঁর সাধ্য নেই যে আমার মুষ্টিতে তরবারি উন্মুক্ত থাকতে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। তাঁর অধরে কি ঘৃণার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল যখন সে বলেছিল, 'সম্রাট নজবৎখানের সঙ্গে তাঁর কন্যার

দেওয়ান-ই-খাস—শাহজাহান

৪৪ পৃঃ

বিবাহ দিতে পারেন না।' আমার মনে হয়, সম্রাট তাঁর কুমারী বেগমকে অন্তঃপুরেই রাখতে অভিলাষী…।"

তারপর আবার অগ্রসর হল নজবৎখান ও তাঁর সঙ্গী জাফর—খাঁ। আবার ফিরে এল সেই বিরাট চীন বিটপীর তলায়: বৃক্ষতলে বিস্তারিত মখমলের আস্তরণের উপর বসল। আমি একটা ক্ষুদ্র আবরণের অন্তরালে এসে তাদের অলক্ষ্যে তাদের আলোচনা শুনলাম। নজবৎ বলছিল, সম্রাটকে শীঘ্রই মত পরিবর্তন করতে হবে, কারণ তাঁর সিংহাসন রক্ষার জন্য তাঁকে শক্তিমানের সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে। শাহজাহান যেমন একদিন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন—শা ওরঙ্গজেব তেমনই একদিন সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। নূরজাহান ছিলেন তাঁর সাক্ষী। জাহানারা বেগম সুন্দরী, সুচতুরা, অর্থশালিনী। সমস্ত সুরাট বন্দরের শুল্ক তাঁর প্রাপ্য—সেই অর্থ তাঁর ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ ব্যয় হচ্ছে…।" (২৮)

এবার নজবৎখান উঠে পড়ল, তার সমস্ত শরীর ক্রোধে কম্পিত হচ্ছিল। নজবৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "আমি জাহানারা বেগমের পাণিপ্রার্থী ছিলাম না। শাহজাদা দারা অহঙ্কারী, প্রশংসাপ্রিয়: দারাই আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়েছেন। আমি জাহানারা বেগমকে দেখেছি মাত্র অবগুণ্ঠনের আবরণে। তাঁর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী আছে একাধিক। বুন্দেলাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। আরও অনেকেই জানে—তাদের নাম দিল্লীর প্রাচীরের পার্শ্বে শোনা যায়।" আমি বিষ-শরবিদ্ধ বনের হরিণীর মত তার কথাগুলি স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলাম। নজবৎ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল—"আমি জানি কেমন করে বন্ধের রাজবংশের সুনাম রক্ষা কর্তে হবে। চাগতাই রাজকুমারীর দেহে রয়েছে কাফেরের রক্তকণা। জাহানারাকে বিবাহ

---

(২৮) মুঘল রাজকুমার কুমারীর ব্যয়ের জন্য গ্রাম, পরগণা অথবা বাণিজ্যশুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। জাহানারার ছিল সুরাটের বাণিজ্য শুল্ক।

করে আমার বংশ মর্য্যাদাকে অলঙ্কৃত করার প্রয়োজন নাই (২৯)। আমার অশ্ব আমিই সংযত করব—অন্যের প্রয়োজন হবে না।"

আমি প্রায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম, আমার শিরার রক্তস্রোত যেন ফুটে বেরিয়ে আসছিল। আমি তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখলাম—মনে হল যেন এই লোকটি সুদক্ষ শিকারী, সর্ব্বদাই নূতন শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত। তার চোখে ভেসে উঠছিল একটি তীক্ষ্ণ ক্রূর দৃষ্টি। সে বল্ল, "আমীর তোমার মনে নেই কি সেদিন অগ্নিকাণ্ডের সময় রাজকুমারীর দেহ দগ্ধ হল, তবুও অন্যকে দেহ স্পর্শ কর্ত্তে দিল না…তাঁর চরিত্রের খ্যাতি সেদিন কি শোন নি?"

অবজ্ঞাভরে নজবৎ উত্তর দিল—"তার রক্তের মধ্যে রয়েছে বহু রক্তের মিশ্রণ। প্রয়োজন হলে প্রেমাস্পদকে লাভ করার জন্য জাহানারা বেগম প্রাণপণ কর্ত্তে পারেন। সেই প্রেমপাত্র সেদিন কোথায় ছিল? অন্ততঃ আমি সে লোক নই। আমি যদি তখন জানতাম সেই প্রেমিকের নাম—আমার তরবারি তার মাথার উপরে শোভা পেত। চলনা, এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু কে যেন আমাকে, আমার চরণকে আবদ্ধ করে রেখেছে।"

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নজবৎ দাঁড়াল, রক্তমণ্ডিত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্ল—"বন্ধু জাফর! একদিন এক রাজকন্যাকে দেখেছিলাম প্রভাতে গবাক্ষ পাশে দাঁড়িয়ে যেন উষার সূর্য্যোদয় দেখছি; সে ছিল এক পবিত্র কিশোরী। অনাঘ্রাত পুষ্পপাত্র, তাকে আমি আমার অন্তঃপুরের রাণী করে নিতাম, তার চরণে আমি নিবেদন কর্ত্তাম আমার সমস্ত মুক্তারাজি। তার দৃষ্টি ছিল নীলকান্ত-মণির মতন উজ্জ্বল। সে দৃষ্টিতে আমার নয়নের সম্মুখে উন্মুক্ত হ'ত সপ্তম স্বর্গের দ্বার। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সে ইহলোক ত্যাগ করে গেল…"

---

(২৯) চাঘতাই মুঘল বংশের সঙ্গে হিন্দুরক্ত ধারার সংমিশ্রণের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তারপর আবার সে বলে চল্ল—"আমার অন্তঃপুরে সকল নারীই বল্কগিরি শিখরচ্যুত তুহিনের মত পবিত্র, অনাঘ্রাত। এবার আমি প্রমোদ কাননে যাব—সেখান থেকে রক্ত গোলাপ তুলে নেব—আমার ইচ্ছামত সে গোলাপ আমার অধর স্পর্শ করবে…"

জাফরকে আমি জানতাম ; জাফর ছিল আওরঙ্গজেবের বন্ধু। জাফর ভারতবাসীকে ঘৃণা করে। সে নজবৎখানের করমর্দ্দন করে বল্ল, "ভাই, ভেবে দেখ, তুমি যদি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্ব্বোত্তম নারী রাজকুমারী জাহানারাকে শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নাও, তবে কে তোমাকে প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে ? জাহানারা বেগম যখন তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন, তোমার অন্তঃপুর হযে উঠবে নন্দন-কানন। জাহানারা হয়ে উঠবেন কুমারী।"

নজবৎখানের দৃষ্টি অকম্পিত ছিল। আমার সম্বন্ধে বল্ল—"আমি যদি কোন নারীকে শত্রুর হস্ত থেকে জোর করে নিতে চাই তবে সে শত্রু হবে আমার সমকক্ষ সমবংশ। কিন্তু জাহানারা যদি আমার অন্তঃপুরকে উপেক্ষা করে কোন কাফেরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে নিশ্চয় জাহানারাকে স্বর্গের 'হুরীর' সম্মানদান করে কৃতার্থ হবে।"

আমি আর শুনতে পেলাম না—আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেললাম। যখন আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেলাম তখন প্রভাতের শিশির সম্পাতে আমার শোণিতধারা ঘনীভূত হয়ে গিয়েছিল।

সেই মনুষ্যদ্বয় চলে গেছে, নিকটে আর কোন মানুষ ছিল না। আমি আমার অজ্ঞাতে মহতব-বাগের (৩০) দিকে গেলাম, সেখানে

(৩০) মহতব-বাগ—চন্দ্রালোক উদ্যান। মহতব অর্থাৎ চন্দ্র। এই বাগিচার সমস্ত ফুলগুলি ছিল শুভ্রবর্ণ। মুঘল রাজান্তঃপুরে বিভিন্ন বাগিচার ফুলদল বিভিন্ন বর্ণের। বাগিচার অভ্যন্তরে বিশ্রামাগার ছিল, সেখানে আলোর ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন বর্ণের।

ক্রীতদাসরা লণ্ঠনের আলোকে কৃষ্ণ সর্পের সন্ধান করছিল—আকাশে তখন আলো ছিল না।

আমাকে কেউ দেখতে পায়নি, আমারও ইচ্ছা ছিল না যে কেউ আমাকে দেখে। আমার পাশে সমস্ত জগৎ যূথী, গোলাপ, পদ্ম, করবীর গন্ধে ভরে গেছে। এখানে বাগিচার ফুলগুলি শুভ্র—সেই শুভ্র পুষ্প-গন্ধ আমার সমস্ত ব্যথায় প্রলেপহস্ত বুলিয়ে দিল। দুই পাশের দীর্ঘ সাইপ্রাস শ্রেণী যেন প্রহরার মতন দাঁড়িয়ে আছে, শ্বেত পদ্মগুলি যেন ফোয়ারার উৎস-জলে তারার মতন শোভা পাচ্ছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার এবং নির্জনতা সমস্ত স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি মখমলের মত মসৃণ তৃণদলের উপর দিয়ে অতি লঘু পদ-বিক্ষেপে চলেছি। মখমলের সূক্ষ্ম মসৃণ রেশমগুলি আমার পদ-চুম্বন করে কৃতার্থ হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল যেন কে অতি সন্তর্পণে আমার বাহু স্পর্শ করল!

আমি সাইপ্রাসের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলাম। সর্পভীতি আমায় অভিভূত করেনি। একটা বিষধর সর্প আমার মনকে দংশন করছিল। একটা উচ্ছ্বসিত ঝরণার পাশে আমি বিশ্রাম করলাম। সেখানে কিঙ্করী প্রদীপ দিয়ে গেছে, বিশ্রামের জন্য ক্ষুদ্র একটি চন্দ্রাতপ সাজান ছিল।

—নারী জন্ম কি ভীষণ অভিশাপ! আমার ইচ্ছা হল—মরুভূমিতে অসহ্যভারাক্রান্ত উষ্ট্রের মতন বিকট চিৎকার করে উঠি—যেন সমগ্র দিল্লীবাসী আমার চিৎকারে চমকিত হয়ে উঠে।

মানুষ নারীর শুচিতা রক্ষা করার জন্য নারীকে অবরোধ করে রাখে,

আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হয়ে ফুলগুলি বিভিন্ন বর্ণ সম্পাত করত। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বাগিচা ব্যবহৃত হত; কারণ বর্ণ ফুলের উপর নির্ভর করত বাগিচার সৌন্দর্য্য এবং সম্ভোগের আনন্দ।

কারণ সে চায় যেন সে অনাঘ্রাত পুষ্পের গন্ধ উপভোগ কর্ত্তে পারে। কিন্তু মানুষ কি জানে, নারীর রক্তে কি আগুন জলে? স্রষ্টা নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন মাতৃত্বের জন্য; সে নারী যখন শীর্ণ শুষ্ক হয়ে যায় নীরবে নির্জ্জনে, পুরুষের তখন কি আসে যায়? পুরুষ তার আখ্যা দিয়েছে সতীত্ব। যদি পুরুষ নারীকে আকাঙ্ক্ষা করে—তাতে নারীর কি মূল্য-মান পরিবর্ত্তিত হয়? হয়ত মুহূর্ত্তের জন্য নারী পুরুষের উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠে—কত দ্রুত সেই মুহূর্ত্তটির অবসান হয়! ইভের পাপের চিহ্ন আজও নারীর দেহে বর্ত্তমান···

আমি জলের নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। জলের রূপ দেখলাম হীরক খণ্ডের মত স্বচ্ছ—দুঃখের পাষাণের মত নির্ম্মম—আমার নয়ন সেই পাষাণে অবগাহন করল। আমার মনে হল, আর যেন কোন দিনই এ জীবনে আমার দৃষ্টি নির্ম্মল হবে না। তারপর আমি চরণে দলিত রামধনুর মতন উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু রামধনু আবার নূতন করে আকাশে উঠবে। সেই ত প্রকৃতির বিধান।

নজবৎখান! বিশালবপু বিরাট খর্জ্জুর-বৃক্ষরাজের মত তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলে—তোমাকে দেখছি শিকামোর বৃক্ষের মত যেদিকে বায়ু বহে, সেদিকেই তুমি অবনমিত হচ্ছ। তোমার ক্ষমতা নেই যে, তুমি নারীর দুঃখের ভার তুলে নেও। তুমি মূর্খের মত ক্রোধবশে যে কয়টি নাম উচ্চারণ করেছ, তার বাইরে তুমি আমার বিষয়ে কি জান? মানুষকে যদি দেবতা আখ্যা দেওয়া যায়; দুলেরা বিষ্ণু বা শিবের মানব-মূর্ত্তি; তাঁর প্রতীকও আমি খুঁজে পাইনি। ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; সেখানে কোন দেবতার মন্দির রচিত হয়নি, সেই বিরাট শিখার আধার নেই। আজও সে আধার সৃষ্টি হয় নি।

একজনকে আমি ভালবেসেছিলাম। বনের হরিণী যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য হিমালয়ের জলধারা আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা করে—আমিও তেমনি

তাঁর বীরত্বের মধ্যে আমার গৌরব কামনা করেছি। বনানীর মাঝে বিভ্রান্ত পথিক যেমন পর্ব্বত শিখরে তুহীন-শীর্ষের ঔজ্জ্বল্যকে স্বর্গের প্রবেশ পথ বলে কল্পনা করে, আমিও তেমনি আগ্রহে তাঁর আত্মার শুচিতা কামনা করেছি

এই ভারতবর্ষে হিন্দু নারীরা লিঙ্গ পূজা করে, তারা সর্ব্বোত্তম মুক্তাহার সেই লিঙ্গ দেবতার চরণে উপহার দেয়, তপোবনে স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি জ্বালিয়ে চন্দ্র দেবতার অর্ঘ্য রচনা করে। তারা প্রকৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতীককে নতজানু হয়ে অবনত মস্তকে অভিবাদন করে। খৃষ্টান ধর্মে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বকে শ্রদ্ধার্পণ করে। যীশু খৃষ্ট স্বয়ং নিষ্পাপ কুমারী মাতার সন্তান। তবে কেন মানুষের জন্ম হবে পাপের মধ্য দিয়ে?

আমি চিন্তার ভারে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। দুঃখের সঙ্গীতের সুরে বয়ে চলেছে জলধারা—বাতাস পদ্ম গন্ধে ভারাক্রান্ত, সুগন্ধি ধূপ পাত্রের মতন মধুক্ষরা আমার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। খদ্যোৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপের মতন রাত্রির বুকে জ্বলছে। ঐ দূরে দীর্ঘশীর্ষ সাইপ্রাস বৃক্ষের উপরে তারকা জ্বলছে আকাশের গায়ে। পাষাণের শিলাতলে আমি নিজকে বিন্যস্ত করে দিলাম। আমি অনুভব করলাম একখানি শীতল হস্ত আমার কম্পিত দেহ অতিক্রম করে চলে গেল।

তারপর আমার অন্তর্দৃষ্টিতে একটি দৃশ্য অনুভব করলাম—সে দিন দরবারে একটি সিংহের খেলা দেখান হয়েছিল। সিংহটি তার মস্তক অবনত করে মানুষের মতন ঘন ঘন মৃদু গর্জ্জন করে উঠেছিল। আমার মনে হল যেন সিংহটি তার সঙ্গিনীর বিরহে কাতর! তারপর আবার দেখলাম সেই মরুদ্যানে যুগল সিংহ। স্রোতস্বতী ঝলমল করছিল, খর্জ্জুর বৃক্ষ শাখা ছড়িয়ে ছায়া বিতরণ করছিল; আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র; সেই ছিল সিংহ-যুগলের পৃথিবীর পরিধি। কিন্তু তারা ছিল খুব সুখী। কাশ্মীর পর্ব্বতমালার সানুদেশে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করত। স্রষ্টার কি উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভিতর এই শক্তির বিকাশে?

আমি অনুভব করলাম, দিবস নিশীথের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কি নিবিড়ভাবে বৃক্ষলতা পশু পক্ষী তাদের জীবন যাপন করে! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যেন আমিই একমাত্র একা। কোথায় সেই মহাপুরুষ যে ভারতবাসীর চক্ষে আমাকে সম্মানের আসন দান করতে পারে? কবে সে দিন আসবে? বিবাহ বাসরের শুভ্র রত্নমণির পবিত্র দীপ্তি কবে আমার নয়নে ভেসে উঠবে?

সন্ধ্যাকাশের রক্তিম পটভূমিকায় আমার নয়নে ভেসে উঠল একটি শুভ্র উষ্ণীষ আর দুটি উজ্জ্বল আঁখি। যেমন প্রহেলিকার উত্তর একটি মাত্র শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি হৃদয়ও একটিমাত্র হৃদয়ের স্পর্শে মুক্তিলাভ করে—অবশ্য সে হৃদয়টি যদি তারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হয়।

আমি খুঁজছি তাঁর প্রথম পত্রখানি—যেখানি আমি আমার বুকের মধ্যে কবচ করে রেখেছিলাম। তার সর্ব্বশেষ পত্রের কয়েক ছত্র আমার কর্ণে প্রতিধ্বনি হতে লাগল—"মুঘল রাজকুমারীর আলেখ্য সংগ্রহের মধ্যে চৌহান রাজপুতের চিত্রপট শোভা পেতে পারে না।"

তুলেরা কি নজবৎখানের মতনই চিন্তা করছিলেন? একটি লৌহ হস্ত যেন আমার হৃদয়কে বজ্র মুষ্টিতে আঘাত করল। আমার চারিদিকে পৃথিবী বিরাট হয়ে উঠল।—অবাস্তব হয়ে উঠল। সাইপ্রাস বৃক্ষ আকাশের সমান উচ্চ হয়ে উঠল।—তারা যেন আমার ব্যথার পরিমাপ। আমার ব্যথা এত গুরুভার হয়ে উঠল যে, আর শিলাতলে আমার স্থান সংকুলান হল না। আমার মনে হল যেন শূন্যতার সীমাহীন গহ্বরে আমি বিলীন হয়ে যাচ্ছি। আর চৈতন্য বিলোপ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার দুঃখ একটি বিকট চিৎকারে মূর্ত্ত হল,—আমার সেই বিকট চিৎকারের শব্দ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ছুটে চলল—সমস্ত প্রাসাদে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল।

প্রভাতে শুনলাম—তারা বলছিল যে, মহতব বাগে রাত্রিতে বেগম জাহানারাকে সর্প দংশন করেছিল।

সপ্তম স্তবক

কাল আমি সুলতান মামুদগজনীর ভারতবিজয় কাহিনী আনসারীর কাব্যে পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল :—

মামুদ ভারতে যে রক্তধারা বইয়েছিলেন তার চিহ্ন আজও দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি ; ভারতভূমি আজও রক্তরঞ্জিত—ভারতের আকাশ এখনও রক্তিমমেঘে আবৃত। মামুদ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও থানেশ্বরের সুন্দর বসতিগুলি ধ্বংস করেছিলেন, কারণ সেগুলি ছিল হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। তিনি দেবমূর্ত্তি-গুলি গজনীর প্রবেশ পথের ধূলায় ছড়িয়ে দিলেন, কারণ দেবতা ছিল ভারতের শৌর্য্যের প্রতীক। * * * * বিস্তৃত ভূমিতে শত্রুর রক্তধারা আরও কত কাল বয়ে যাবে। সে ভয়ার্ত্ত জননী সন্তানের রক্তে রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শিনী—তিনি নতুন সন্তানের মাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করবেন। আজও গজনীর উষ্ট্র-পদরেখা রক্তরঞ্জিত, গজনীবাসীর তরবারি রক্তরঞ্জিত।

জ্ঞানিগণ চিন্তান্বিত, নারীকুল শোকার্ত্তা—কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে ?—মানুষের অন্তরে রয়েছে ব্যাঘ্রের হিংস্রবৃত্তি।

১০৬৭ হিজরী জুলহজ আহিরা মাসে সম্রাট শাহাজানাবাদে রোগশয্যা গ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহর রজনীতে আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। আমার মনে হল যেন আমার শিবিকা বাহকের পদনিম্নে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হচ্ছিল। নানা চিন্তাস্রোত গঙ্গাজল ধারার মত বয়ে গেল, মনে হল যেন তৈমুরবংশের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হয়ে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলাম—"পিতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করব না", কারণ আমার সম্রাট পিতা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলেন, এমন কি আমার ন্যায় হতভাগিনীকেও

সম্রাট শাহজাহান ৫৩ পৃঃ

তিনি ভয় করতেন। তিনি জানতেন তাঁর দুঃসাধ্য রোগের সংবাদে সমস্ত দেশব্যাপী কি বিরাট ঝড় উঠবে। তিনি বল্লেন—"আমার করতল চুম্বন করে দেখো, আমার হাতে কি আপেলের সুমিষ্ট গন্ধ আছে?" আমার মাতাকে এক সন্ন্যাসী দুটি অকালপক্ক আপেল উপহার দিয়েছিলেন—সেকথা সম্রাট বিস্মৃত হন নি। সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন—"হে জগদাশ্রয়! যেদিন তোমার হাত থেকে এই আপেলের গন্ধ চলে যাবে, সেদিন জানবে, তোমার জীবনশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছে।" তারপর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার কোন পুত্র কি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন—"হাঁ, যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ।" সে ছিল আওরঙ্গজেব, যদিও তখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর, তখনই সম্রাট তাঁর তৃতীয় পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্টি হয়ে উঠলেন। আওরঙ্গজেবকে তিনি বলতেন "শ্বেতসর্প"।

রোগের প্রথম দিন হতেই রাজপ্রাসাদ ত্রিশ সহস্র প্রহরীবেষ্টিত করা হয়েছিল। সেই প্রহরী ছিল রাজপুত; কারণ একমাত্র রাজপুত-বাহিনীই তাঁর বিশ্বাসের পাত্র ছিল। শাহবুলন্দ্ ইকবাল্ দারাই একমাত্র রাজপ্রাসাদে সামান্য অনুচর নিয়ে দিনে দুইবার প্রবেশের অনুমতি পেলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে পিতার মৃত্যু আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দারা পিতার রোগ সংবাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত বীজের মতন মিথ্যা সংবাদ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল—সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে। দামামার শব্দে যুদ্ধের অশ্ব যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে—তেমনি করে মানুষ যুদ্ধের জন্য তরবারি শাণিত করতে আরম্ভ করল। আমীর ওমরাহ সকলেই প্রস্তুত। তস্কর দস্যু সকলেই নিজের স্বার্থ-সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিন দিন তিন রাত্রি আমরা উদ্বেগে বিমূঢ় হয়ে রইলাম। সমস্ত বিপণি রুদ্ধদ্বার, আমোদ উৎসব স্তব্ধ; গোপন পথে সংবাদ চলাচল হতে লাগল।

আমার ভগ্নী রোশেনারা গোপনে বার্ত্তা প্রেরণে পারদর্শিনী, আওরঙ্গজেব গোপন বার্ত্তা গ্রহণে সুকৌশলী। আমার অন্য দুটি ভগ্নীও ভ্রাতাদের কাছে গোপন সংবাদ প্রেরণ করতেন। স্ফুলিঙ্গ অন্তঃপুরে ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—তা' অগ্নিশিখা হয়ে ফুটে উঠল ভ্রাতৃবিরোধ-রূপে। তাজ বেগমের তিন পুত্র যুদ্ধধ্বনি করে উঠল। 'ইয়া তকৃত ইয়া তাবুত'—হয় সিংহাসন, নয় মৃত্যু। কিন্তু যুবরাজ দারা সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত। তাঁর কাছে সকলেই বশ্যতা স্বীকার করল।

প্রথমে অভিযান আরম্ভ করলেন শাহজাদা শুজা বাঙ্গালা থেকে। দারার নিপুণ সৈন্যদলের একাংশ শুজার সঙ্গে যোগ দিল। তিনি সংবাদ রটনা করলেন—সম্রাট শাহজাহানকে দারা বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন। কিন্তু দারার বীরপুত্র সুলেমান শুকো শুজাকে পরাজিত করলেন।

পিতা অল্প দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হলেন। সমস্ত দরবার দিল্লী থেকে আগ্রা চলে গেল—সমস্ত দেশ যেন জানতে পারে, সম্রাট জীবিত। মুরাদ গুজরাট থেকে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হল। সুচতুর সুকৌশলী মায়াবী আওরঙ্গজেব মুরাদকে তাঁর দলে টেনে নিলেন। আওরঙ্গজেব জানতেন মুরাদ বীর, সাহসী, যোদ্ধা। তাঁরা সমবেত শক্তি দিয়ে দারাকে পরাজিত করবেন স্থির করলেন। দারাকে তাঁরা সকলেই ঘৃণা করতেন, কারণ দারা ইসলাম-বিচ্যুত। দারাকে তাঁরা বিধর্ম্মী "কাফের" আখ্যা দিলেন।

আমি দেখলাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন বাঙ্গালা দেশ থেকে কৃষ্ণ সর্পের দল ছুটে চলেছে। সম্রাটের জ্যোতিষিগণ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন—রাজ্যের অমঙ্গল কেটে যাবে, সম্রাট নীরোগ হবেন। আমার কিন্তু মনে হল—কৃষ্ণ সর্পের মস্তকে যে শ্বেত সর্প বসেছিল, সে সর্প স্বয়ং আওরঙ্গজেব। আজ সেই সর্প শির উত্তোলন করেছে, মন্থরগতিতে তৈমুর বংশের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, কিন্তু কোথায় যাবে? আকাশ-পথে নক্ষত্রের গতি অনুসরণ করে কি প্রশ্নের উত্তর স্থির হবে?

বিদ্রোহের সংবাদ পেলাম আমরা বিলোচপুরে—সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে। তখন সম্রাট আবার ফিরে চলেছেন—রাজধানীর দিকে। সুতরাং আমরা সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে চল্লাম।

এবার হতভাগ্য সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের গতি অতি গুরুভার মনে হল। "বিলোচপুর"—এই নামটি তীরের মতন আমাদের বিদ্ধ করল। এইখানে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার শাহজাহান তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন।

আকাশে সূর্য্য তীক্ষ্ণ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা রাজপথের পার্শ্বস্থিত দীর্ঘ বিটপীশ্রেণীর আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমি পিতার পার্শ্বে বিরাট শকটের অভ্যন্তরে বসে আছি। এই শকটখানি ইউরোপ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীর বাদশাহ পেয়েছিলেন। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলেছি—নীরবে। শাহজানাবাদ ত্যাগ করে মনে হ'ল যেন আমরা পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।

আমি আমার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম—এ যে আমার যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন করার মতন। কেন যেন আমার বিশ্বাস হয়েছিল দুলেরা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে তাঁর পুরাতন পদে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। এই কয়েক বৎসরের ঘৃণা, হতাশা, বিস্মৃতির ব্যবধানে ফিরোজশাহ-পরিখার তীরসংলগ্ন বনশাখার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত অস্তসূর্য্যের কিরণ আমাকে খুব অভিভূত করেছিল। সেখানে আমার মনে হ'ল যেন সব জিনিষই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে—যেন কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নি।

মধ্যপথে একটি মর্ম্মর কূপের পার্শ্বে এসে আমাদের বাহিনী বিশ্রাম নিল। আমাদের শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়কে স্নান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সমরখন্দের তরমুজ আহার করলাম, আমার সুরাপাত্র থেকে আমরা শরাব পান

করলাম। তারপর পিতা খুব দ্রুত শকট পরিচালনার জন্য আদেশ দিলেন।

পিতা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই প্রথম অনুভব করলাম, পিতা কত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্বর্ণগোলাপখচিত রাজ-ভূষণের মধ্যে তিনি যেন কুঞ্চিত হয়ে পড়েছেন—তাঁর পরিচ্ছদে শরাবের ধারা বয়ে পড়েছিল। সম্রাটের আকৃতিতে তাঁর প্রথম জীবনের পৌরুষের চিহ্ন মাত্র ছিল না। তাঁর বিশ্ববিজয়ী চক্ষুর জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে। আমি অনুভব করলাম যে, এক বিরাট অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে।

সম্রাট মীরজুমলার বিষয় অবতারণা করলেন—তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। এক পারস্য-সন্তানকেই না সম্রাট রাজসম্মানে বিভূষিত করে-ছিলেন, মুয়াজ্জম খান (৩১) উপাধি মণ্ডিত করেছিলেন? তাঁর আশা ছিল যে, মীরজুমলা হিন্দুস্থানের জন্য কান্দাহার জয় করবেন। আজ সেই মীরজুমলাই সম্রাটকে প্রবঞ্চনা করেছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওযার মতন কিছু ছিল না। আমরা যতই দিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছি, আমার মন ততই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

এই মীরজুমলাই ত একদিন গোলকুণ্ডার পথে পাদুকা বিক্রয় করত, তারপর সে অর্জ্জন করল অর্থ ও শক্তি; লাভ হ'ল গোলকুণ্ডার উজিরের আসন, শেষে পেল আওরঙ্গজেবের বন্ধুত্ব। শেষ পর্য্যন্ত মীরজুমলা গোলকুণ্ডার রাজমহিষীকে বিপথচারিণী করল, সুলতান তাঁকে কারাগারে বন্দী করবার উদ্যোগ করলেন। মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের সাহায্য প্রার্থনা করল। আওরঙ্গজেব সাহায্য কর্ত্তে এসে লুণ্ঠন করলেন রাজধানী, সেখানে করলেন প্রাচীন রাজবংশের সমাধির রত্ন অপহরণ। এই করেই ত আওরঙ্গজেবের শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

---

(৩১) মুয়াজ্জম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সম্মান পাত্র।

আমি বারম্বার সম্রাটকে মীরজুমলার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম মীরজুমলার বিরুদ্ধে। একদিন ছিল, যখন সম্রাট শাহজাহান আমার পরামর্শ শুনতেন—যেমন শুনতেন আমার মায়ের কথা। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি দূরে সরে গেলেন আমার কাছ থেকে—মায়ের কাছ থেকেও…

আমরা বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জাঁহাপনা, আপনার মনে পড়ে কি?—আমি ও দারা আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—আওরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা থেকে ফিরিয়ে আনুন, যেন সে খুব শক্তিশালী হয়ে না পড়ে। আপনার মনে পড়ে কি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে মীরজুমলা আপনাকে একখণ্ড হীরক উপহার দিয়ে বলেছিল—কান্দাহারের রাজকোষে যে হীরকখণ্ডের সমতুল্য কোন হীরক নেই যদি মীরজুমলাকে একদল বাদশাহের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা হয় তবে সে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, সিংহল ও করমণ্ডল প্রদেশ জয় করে অগণিত হীরক বাদশাহকে উপহার দিতে পারবে। তারপর মীরজুমলা একমুষ্টি প্রস্তর সম্রাটকে উপহার দিয়েছিল। সম্রাট মীরজুমলার অধীনে সৈন্যের ব্যবস্থা করলেন। আমি এবং দারা কত নিষেধ করেছিলাম। আজ সেই সৈন্য নিয়ে মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে। সম্রাটের সে কথা মনে পড়ে কি?" সম্রাট একটু অবহিত হয়ে বসলেন। মনে হ'ল যেন তিনি অসংখ্য রাজমুকুটের আলোক মণ্ডিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন, সে আলোর দীপ্তি তৈমুরের রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনে হল, সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজদণ্ড নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন করছেন। তারপর মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাট নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন—আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম, সম্রাটের উপর পুনরায় আমার অধিকার ফিরে পেতে হবে। আমি আবার বলে উঠলাম, "ফকির আওরঙ্গজেব এমন লোক নন যে,

বহিরাভরণের চাকচিক্য দ্বারা মুগ্ধ হবেন, আপনার মনে আছে আওরঙ্গজেব কি উপায়ে তার দরবেশ বন্ধুদের এক লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিলেন। একবার আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, তাদের নিকট কিছু মুক্তা খরিদ করবেন। কিন্তু তাঁর ওস্তাদ শেখ মীর বক্স বলেছিলেন—এই মুক্তা অপেক্ষা আরও বৃহৎ মুক্তা আছে হিন্দুস্থানে। যদি সেই মুক্তা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে এই অর্থ নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ কর, তা' হলে বৃহৎ মুক্তাখণ্ড তোমার করতলগত হবে। আওরঙ্গজেব তাই করেছিলেন। সেই সৈন্য দিয়ে তিনি আমার সুরাট বন্দর অধিকার করেছেন। আগ্রায় আমাদের মণিমুক্তার প্রয়োজন নাই—আমরা চাই অর্থ, সৈন্য, অশ্ব।"

এবার আমি নীরব হলাম—আমার ভয় হল, আমার স্বর আবেগ কম্পিত। পিতা আমার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর দেহযষ্টি কি কুব্জ হয়ে গেছে? তাঁর নয়নে কি সন্তান বাৎসল্য ফুটে উঠেছে যেমনটি ফুটে উঠত আমার শৈশবে—যখন খেলতে খেলতে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম!

পিতা বলেন—"জাহানারা। তোমার কি মনে নাই—কে আমাকে অনুরোধ করেছিল আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করতে, তাকে গুজরাট থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়ে নিতে। সেই দাক্ষিণাত্যেই ত আওরঙ্গজেব সৈন্য সমাবেশ করেছে।" আমার কপালে পিতা তাঁর উত্তপ্ত করতল বুলিয়ে দিলেন। পিতা বলে চল্লেন—"তোমার মনে পড়ে? কতবার তোমায় সাবধান করেছিলাম তাকে বেশী বিশ্বাস করো না। দূর থেকে সাপ খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে সাপ বিষ হয়ে বেড়ায়। জন্মের ছয়দিন পরে দারার ললাটে আমি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন দেখেছিলাম—কিন্তু আওরঙ্গজেবের ললাটে ছিল জয়তিলক। অদৃষ্টের আবরণ যদি কৃষ্ণ সূত্র দিয়ে বয়ন করা হয়ে থাকে, বিশ্বের সমস্ত জলধারা তাকে শুভ্র করে দিতে পারে না।" অবনমিত হয়ে আমি পিতার হস্তচুম্বন করলাম। পিতার অভিযোগ যথার্থ-ই সত্য। আমি এবং দারা আওরঙ্গজেবের
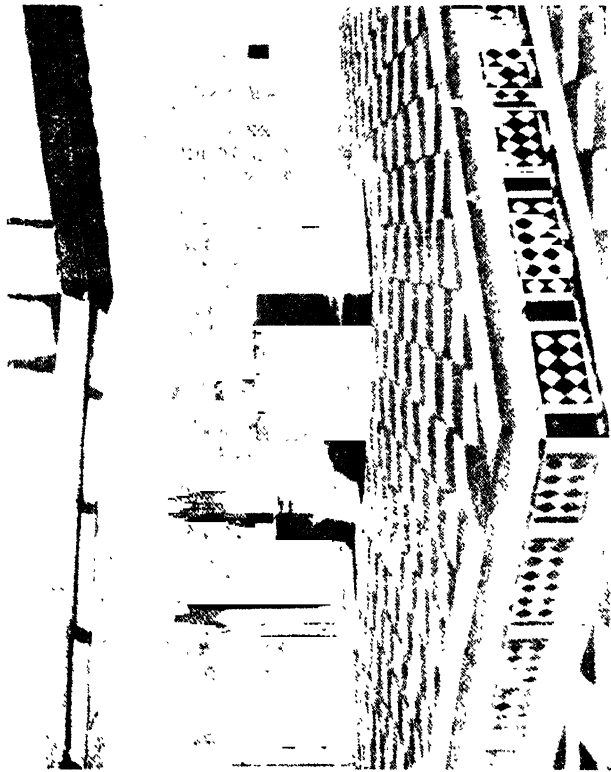
আকবরের সমাধি—সেকেন্দ্রা

৫৯ পৃঃ

পত্র দ্বারা কতবার বিভ্রান্ত হয়েছি। পত্রে সে কি ভীষণ প্রবঞ্চনা ছিল—তা' বুঝতে পারিনি। কতবার পিতার কাছে আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

আমরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্লাম। আজ মনে হচ্ছে যেন সেই অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ, কৃষ্ণচক্ষু, রাজকুমার আওরঙ্গজেব আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন—যেমন আসে ব্যাঘ্র লোলুপদৃষ্টিতে শিকারের দিকে। তিনি কি তৈমুর-বংশের শেষ সন্তানকে আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন? কিন্তু, রাজদণ্ড ত' শাহজাহানের হস্তচ্যুত হয়নি।

আমরা আগ্রার অদূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রায় প্রবেশ করেছি। পিতা ও আমি—আমরা দু'জনমাত্র সেই বিরাট প্রাচীরের সুবিশাল তোরণ অতিক্রম করলাম। সেখানে আকবর সমাধিতে বিশ্রাম করছেন। আজকের মতন কখনো এই সমাধির শুচিতা আমাকে অভিভূত করেনি। রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত অতুলনীয় বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে আমরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম। আমি কিন্তু আমার মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম—সেই ছিল সম্রাট আকবরের অনুশাসন। তারপর আমরা সমাধির শিলাতলে আরোহণ করলাম। সমাধির চতুষ্পার্শে ছিল বিভিন্ন দিকে প্রসারিত তোরণশ্রেণী, আর বিচিত্র কারুকার্য্যময় মর্ম্মর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রাচীরবেষ্টিত শিবির।

এখানে কোন মানুষ ভারাক্রান্ত নয়, এখানে কোন অত্যাচার নাই। এখানে মানুষ স্বস্তিতে নিশ্বাস নেয়। যতগুলি মানব আত্মা ততগুলি পথ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে—এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম আমি সেকেন্দ্রার প্রাসাদে।

সম্রাট আকবরের কি অভিলাষ ছিল তাঁর মৃত্যুর পর **দীন্-ই-ইলাহী** (৩২) সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে সম্মিলিত হবে? সম্রাট আকবর

(৩২) **সম্রাট আকবরের প্রচারিত ধর্ম্মমত।**

তাঁর "পাঁচমহল" সমাধি নির্ম্মাণ করবার সময় কি সম্রাট অশোকের কথা ভেবেছিলেন? সম্রাট অশোক সুচারু কারুকার্য্যমণ্ডিত বিরাট মন্দিরোপম বৌদ্ধমঠে তাঁর সংঘাশ্রমের শ্রমণদের আহ্বান করতেন। সেখানে সহস্র সহস্র সংঘ-ভ্রাতা মক্ষিকার মতন প্রকৃতির মধুচক্র থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।

আমার সম্রাট পিতা ক্রমশঃ চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন—তোরণের পাশে ইতস্তত পাদচারণা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কি তাঁর পিতামহের স্নেহের কথা স্মরণ করলেন? সম্রাট আকবরের মৃত্যুশয্যায় ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে বিদ্রোহী পুত্র সেলিম তাঁর পিতার সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহস করেন নি; কারণ তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সেই সময় খুর্‌রাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতদিন সম্রাট আকবর জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি সম্রাটকে ত্যাগ করবেন না। সম্রাট শাহজাহানের কি আজ মনে পড়েছে এই সমাধিতে শায়িত মহাপুরুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেই শিশুই ভবিষ্যতে এক বিরাট ব্রত উদযাপন করবেন।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। আমি উপরের তলে চলে গেলাম—সে তলটি ছিল সম্পূর্ণ শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত। সম্রাট আকবরের সমাধি প্রকোষ্ঠ ছিল প্রস্তর-নির্ম্মিত জালের আবেষ্টনীবদ্ধ; দূর থেকে মনে হয় যেন সারিবদ্ধ গবাক্ষের সমাবেশ। গবাক্ষ মধ্য দিয়ে উদ্যানের সবুজ তৃণগুচ্ছ মানুষের দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। সুবর্ণমণ্ডিত সমাধির গম্বুজটি আকাশের মতই গোলাকৃতি, শ্বেতমর্ম্মর পুষ্প, কৃষ্ণমণি রেখাঙ্কিত শবাধারটি দিবসে সূর্য্য কিরণে এবং নিশীথে চন্দ্রালোকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে। নিম্নতলে একটি গহ্বরে শুভ্র মর্ম্মর শবাধারে শায়িত রয়েছেন হিন্দুস্থানের সর্ব্বশেষ বীর। উদীয়মান সূর্য্যের দিকে রক্ষিত ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। প্রাচীর গাত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে স্ফুরিত সূর্য্যালোক তাঁকে উদ্ভাসিত করে তুলছিল।

সেই শুভ্র শবাধারের সম্মুখে নতজানু হয়ে আমি প্রণাম করলাম—আমার নয়ন থেকে ঝরে পড়ছিল তপ্ত অশ্রুবিন্দু মর্ম্মর গোলাপের উপর। আমি যদি প্রাচীন ঋষিদের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হতে পারতাম—আমার প্রার্থনা দ্বারা যদি আমি সেই বিরাট পুরুষকে পুনর্জীবন দিতে পারতাম তবে তিনি আমার ভারতবর্ষকে অন্ধকার বিমুক্ত করে দিতেন। আমার মনে হল—তিনি সেই প্রস্তর সমাধি ভেদ করে তাঁর বক্ষ উত্তোলন করলেন—আর প্রস্তরখণ্ড বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন :—

"আমার সাম্রাজ্যকে চিরন্তন করে দাও—"

আমার পিতার পদধ্বনি শিলাতলে শুনতে পেলাম। আমার ইচ্ছা হ'ল সম্রাট শাহজাহান সমাধিতে একাকীই বিশ্রাম করুন। তাই আমি দ্রুতপদে উদ্যানের দিকে চলে গেলাম। এই উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত পুণ্যভূমিখণ্ড যে আমার তীর্থস্থান—আমার চক্ষুর সম্মুখে রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদভূমি মেরুশীর্ষে পরিণত হবে, তার বৃক্ষশীর্ষ-চূর্ণা মেরুর শুভ্র শিখর হবে দেবমন্দির। সম্রাট আকবরের সমাধি স্পর্শ করে চলে গেছে চতুষ্কোণ বিসর্পিল পথশ্রেণী। তার মধ্যদেশ অতিক্রম করে ক্ষীণ পয়োধারা বয়ে চলেছে। চারিটি নদীশাখা একটি নিভৃত কূপতল হতে নিঃসৃত হয়ে চারিটি নদীতে পরিণত হয়ে চলেছে : উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে—জননী বসুন্ধরাকে উর্ব্বর করে দিচ্ছে। আমার মনে হল এই স্থানে সমস্ত বিটপীই পবিত্র। বিটপীচ্ছায়াকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে আমি স্থিরপদে চলেছি ; আমার পথপ্রান্তে দাড়িম্ব বৃক্ষদল জীবনের সন্ধান জানাচ্ছিল—আর সাইপ্রাস বৃক্ষ মৃত্যু ও অনন্তের বার্তা দোলাচ্ছিল।

রাজকোষের সুবর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে—শ্বেতবাস পরিহিত মোল্লারা সেই সমৃদ্ধ কল্পদ্রুমের ফলরাশি চরম করে দরিদ্রের নামে তুলে নিচ্ছে। আমার কণ্ঠহার লহরীর পর লহরী আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

আগ্রায় পুনঃ প্রবেশ করার পূর্ব্বে আমার বাসনা হ'ল—আর একবার আমার চতুষ্পার্শ্বের বসুন্ধরাকে নিরীক্ষণ করব! আমি বহির্দ্দেশে তোরণের উপর আরোহণ করলাম।

নীলসলিলা যমুনা নীলাকাশের নীলিমার সাথে রঙ মিলিয়ে বয়ে চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে—আগ্রা প্রাসাদের উচ্চ মিনারগুলি মেঘের কোলে প্রাসাদের মত শোভা পাচ্ছে; সম্রাট আকবরের পরিত্যক্ত নগর ফতেপুরশিক্রীর প্রবেশতোরণ দক্ষিণ আকাশের পটভূমিকায় প্রতিভাত হচ্ছে; আর কতদিন এই সবুজ প্রান্তর সবুজ থাকবে? রক্তের স্রোত আর রক্ত-পদ-চিহ্ন কতদূর? আর কতদিন প্রাসাদের নর্ম্মউদ্যান বিহঙ্গমের নির্ভয় সঙ্গীতে মুখরিত থাকবে? যুদ্ধের দামামাধ্বনি কবে তাদের নীরব করে দেবে?

আমি প্রত্যাশা করছি—আমার সহোদর ভ্রাতাভগ্নীদের সঙ্গে ক্রীড়া নিকেতন শৈশবের ফতেপুরের তোরণ অতিক্রম করে যাব। সম্ভবতঃ সেখানে এমন একটি মন্ত্রপূত বস্তু পাব, যার প্রভাবে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে।

রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত আকবরাবাদের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেখানে আজ আমি বন্দিনী। প্রাসাদের বর্ণ অস্তায়মান সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা আরও গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বিপণির জনপথ আজ জনহীন। চীৎকার করে একটি কালো পাখী ঐ জলাশয় থেকে উড়ে গেল। আমি এই অশুভ চীৎকারে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার ইচ্ছা হ'ল, যেন আমি শাহজানাবাদের দিকে চীৎকার করে সেই পাখীটির প্রত্যুত্তর দিই।

আমরা সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, পথে দেখলাম দিল্লী তোরণের মধ্য দিয়ে এক দল সুসজ্জিত অশ্বারোহী আমাদের পথ অতিক্রম করে গেল। হস্তীযূথবাহিত শিবিকা চলেছে—সম্রাট-তনয়া বেগম

রোশেনারার শিবিকা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম জালের আবরণ বেষ্টিত। একটি কিশোর ক্রীতদাস সুবর্ণখচিত ময়ূরপুচ্ছের ব্যাজন দোলাচ্ছিল। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনো বিস্মৃত হব না। আমাব মনে হ'ল, হস্তী দুইটিআমাদের মথিত করে চলে যাবে। আমাদের অগ্রগামী দল থামল। তীব্র আতরের গন্ধে সমস্ত বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। আমার ভগ্নী রোশেনারা তাঁর জালের আবরণ তুলে দেখ্‌ছিলেন। আমি তাঁর চিত্রিত মুখমণ্ডলের শুভ্রদন্ত পংক্তি অবলোকন করলাম। অশ্বারোহীদলকে অগ্রসর হতে অনুমতি দেওয়া হ'ল। রাজকুমারী চলেছেন জুম্মা মসজিদে সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে। সে মসজিদ আমিই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম। সম্রাট শাহ্‌জাহান শুষ্ককণ্ঠে আপন মনে বলেছিলেন—"আমার রোপিত প্রত্যেক বৃক্ষটি শুভফলপ্রসূ হয়নি।"

রাজপ্রাসাদের তোরণে প্রবেশ না করতেই ·ঝলাম যে, রাজদরবারের সব ব্যবস্থাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। শুনলাম, শায়েস্তা খান এবং মীরজুমলার পুত্র আমিন খান আওরঙ্গজেবের কাছে লিখেছে—"সম্রাটের জীবন শেষ হয়ে এসেছে, যদিও তিনি প্রত্যহ ঝারোখা দর্শনে (৩৩) এসে প্রজাদের দর্শন দিচ্ছেন এবং প্রজারা তাঁর দর্শন পাচ্ছে—কিন্তু তাঁর মৃত্যু নিকট।" সেই দুইজন আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে লিখেছে, যেন তাঁরা সসৈন্যে আগ্রায় উপস্থিত হন। সুলেমান শুকো তার সুসজ্জিত সৈন্য-বাহিনী নিয়ে সুবা বাঙ্গালায় শুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে। তার আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই রাজকুমারদ্বয়ের আগ্রায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পত্রখানি দারার হাতে পড়েছে—সেই দুই বিশ্বাসঘাতককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সমস্ত প্রজা তাদের বিচারের সংবাদ শোনাবার জন্য সমস্ত দিন

---

(৩৩) ঝারোখা-ই-দর্শন—মুঘল সম্রাট প্রতি প্রভাতে পূর্ব্বমুখী অলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রজাবর্গকে জানিয়ে দিতেন যে তিনি জীবিত। প্রজাকুল তাঁকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলে অভিনন্দন জানাত। আওরঙ্গজেব এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন কারণ এই প্রথায় তিনি মূর্ত্তি পূজার গন্ধ পেলেন।

দারার প্রাসাদের সম্মুখে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু দারার মন ছিল কোমল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের দ্বার খুলে গেল—আমার ভগ্নী রোশেনারা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের পতনের পথও সুগম হয়ে গেল।

এবার আমার লেখনী স্তব্ধ হয়ে এসেছে; মনে হচ্ছে যেন অতীত দিনের সীমাহীন দুঃখের স্মৃতি আমাকে হতচেতন করে ফেলেছে। পাত্রাধারে মসী আমার রক্তে পরিণত হয়ে আসছে। হে পবনদেব, সমস্ত প্রভঞ্জন বিমুক্ত করে দাও! প্রভঞ্জন, তোমার সঙ্গে সমস্ত মেঘ নিয়ে এসো। দিল্লীর উপর তোমার শোকাশ্রু বর্ষিত হউক! দিল্লী, তুমি আর্ত্তনাদ করে ওঠো!

ঊর্ণনাভ-জালের মত নীরবে চলেছে গুপ্তচরের দল রাজদরবারের ও শিবিরের সংযোগ রক্ষা করে। মীরজুমলা ঘোষণা করেছে যে, সে সম্রাট শাহজাহানের পতাকাতলে আশ্রয় নেবে। তাঁর ভাষায় শক্তি ছিল, তাঁর ব্যবহারের চাকচিক্য ছিল। দারা ও সম্রাট তাঁর কথায় একান্ত বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু সম্রাটের সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন—"সম্রাট মৃত, যদি আপনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন তা'হলে আপনাদের বেতন বর্ধিত করা হবে। যে ধর্ম্মহীন দারা হজরত মহম্মদের বাণীর বিরোধিতা করে—সেই দারার পক্ষ আপনারা বীরের দল কি করে সমর্থন করবেন?" সেনাপতিরা কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করল, যদি সম্রাট সত্যই পরলোকগমন করে থাকেন, তবে তারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করবে। কিন্তু তারা দূত প্রেরণ করল সঠিক খবর জানতে—সত্যই সম্রাট শাহজাহান কি মৃত! কিন্তু যারা সংবাদ সংগ্রহ কর্ত্তে এসেছিল—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাদের প্রত্যেককে নর্ম্মদা অতিক্রম করার পর পরীক্ষা করা হ'ল, যাদের সঙ্গে সঠিক সংবাদ ছিল তাদের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হ'ল।

এই পন্থা অবলম্বন করে আওরঙ্গজেব পিতার সমস্ত সেনাপতিকে স্বপক্ষে টেনে নিলেন। একমাত্র মহাবৎ খান তাঁর সৈন্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন, তারপর আগ্রায় চলে এলেন। তিনি তাঁর বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন, তাঁর রক্তে রয়েছে রাজপুতের বীজ; তাঁকেও একদিন আমি ভ্রাতার মর্য্যাদা দিয়েছিলাম।

দাক্ষিণাত্য থেকে যাত্রা করার পূর্ব্বে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষকে নতজানু হয়ে তাঁর বিজয়ের জন্য আল্লাহের কাছে প্রার্থনা জানাতে বল্লেন। প্রার্থনা শেষে আওরঙ্গজেব আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দরায়ুসের অভিযানের সময়কার উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন···"হয় আমি আমার শত্রুর শিরচ্ছেদ করব, নয় আমার শির ছিন্ন হবে।"

আওরঙ্গজেব জানতেন, প্রার্থনা সফল করার কৌশল। বল্কের যুদ্ধে যখন আওরঙ্গজেব বোখারার সুলতানের অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরিচালনা করছিলেন—তাঁর প্রশংসায় সমস্ত মুসলিম জগৎ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দ্বিপ্রহরের নামাজের সময় আওরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে যুযুধান সৈন্যদলের মধ্যস্থলে নতজানু হয়ে স্থিরভাবে সম্পূর্ণ নমাজ সম্পন্ন করেছিলেন। বোখারার সুলতান আবদুল আজিজ চীৎকার করে বলে উঠল—"অমন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মৃত্যুর সমান।" তারপরই দামামার ধ্বনিতে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হ'ল।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ হয়েছিল রজব মাসে। সিংহবিক্রমে মুরাদ আমার পিতার বন্ধু রাজা যশোবন্ত সিংহ ও আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী রাজপুত বীরদের পরাজিত করেছিলেন, কারণ, আমাদের মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ছিল বিশ্বাসঘাতক। সে তার সমস্ত গোলাবারুদ আওরঙ্গজেবের জন্য ভূমিমে প্রোথিত করেছিল এবং স্বয়ং যুদ্ধের সময় সসৈন্যে অনুপস্থিত ছিল। যখন যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন তাঁর মহিষী দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিলেন; বল্লেন, "পরাজিত স্বামীর অভ্যর্থনা করা অপেক্ষা বিধবা হয়ে

স্বামীর জ্বলন্ত চিন্তায় আরোহণ করাও শ্রেয়। রাজপুত যুদ্ধে জয়লাভ করে, অথবা মৃত্যুবরণ করে।"

উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পরে বিজয়ী ভ্রাতৃদ্বয়ের সৈন্য আগ্রার দিকে অগ্রসর হ'ল। নিতান্ত হতাশ হয়ে পিতা স্বর্গের দিকে হস্ত উত্তোলন করে চীৎকার করে উঠলেন—"ইয়া আল্লাহ্, তেরী রেজা" (হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা।) আমার পাপের শাস্তিভোগ কচ্ছি, এই শাস্তিই আমার প্রাপ্য। তিনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'লেন এবং আদেশ দিলেন—"সৈন্য সমাবেশ কর।"

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার সময় তৈমুর কি সামান্য সৈন্যের মতন স্বয়ং যুদ্ধ করেন নি? শাহজাহান যদি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, দেশবাসী জানবে যে, সম্রাট জীবিত। যদি সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকতেন, তবে আজ বাবরের ভারতবর্ষে, আকবরের ভারতবর্ষে কি পরিস্থিতি হতো কে জানে? "একটি মাত্র মস্তিষ্ক সমস্ত অঙ্গ চালনা করে"—আজ যারা সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিল তারা প্রত্যেকেই ত সম্রাটের সৈন্য, তারা সকলেই সম্রাটের নিকট কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। তখনও দিল্লীর সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। গৃহের প্রদীপ যেমন দূরের পথিককে আকর্ষণ করে, তেমনি রাজমুকুটের দীপ্তিশিখা সমস্ত দেশকে অলোকিত করত।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের দল অন্যরূপ ব্যবস্থা করেছিল, তারা সেরূপ হতে দেয়নি। সম্রাটের শ্যালক শায়েস্তা খানের হৃদয়ে ছিল—তীব্র ঘৃণা, কণ্ঠে ছিল উপদেশের সুর। খলিলুল্লা খান শায়েস্তা খানের মত তাঁর স্ত্রীর অপমানের গ্লানি বিস্মৃত হননি। (৩৪) তারা দুজনেই জানত, মিষ্ট কথায় সম্রাটের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করা যায়।

---

(৩৪) খলিলুল্লা খানের স্ত্রী ও শাহজাহানের সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা প্রচারিত ছিল। ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধের জন্যই খলিলুল্লা খান শাহজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

দুষ্টবুদ্ধি শয়তান একদা স্বর্গের দ্বারের পাশে অলক্ষ্যে সৃষ্টির গোপন রহস্য জেনেছিল। এবার শয়তান নিয়তি পূর্ণ করতে অগ্রসর হ'ল। সম্রাট রাজদরবারে রাজপুত বীর রামসিংহ এবং বুন্দীরাজ ছত্রশালকে সমস্ত অমাত্যের উপরে আসনদান করেছিলেন। সম্রাটের আহ্বানে রাজা ছত্রশাল বিলোচপুর থেকে আগ্রা উপনীত হবার পূর্ব্বে আমরা দিল্লী থেকে আগ্রা চলে এসেছিলাম। বহু বৎসর আমি আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের দর্শন পাইনি—আমি তার সেই মারাত্মক পত্র খুলে দেখবার পর আর তাঁর দেখা পাইনি।

রাত্রিপ্রভাত হয়ে এসেছে। একটি ধূসর দেহ রক্তগ্রীব কপোত দূত প্রেরণ করা হ'ল। সে রাজা ছত্রশালকে আহ্বান করে রাজদরবারে নিয়ে আসবে।

গ্রীষ্মকাল; অসংখ্য ফুল ফুটেছে, ভ্রমর গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত। পুষ্পকোরকের সুগন্ধ আঙ্গুরীবাগকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। পিতা তাঁকে পরামর্শের জন্য খাসমহলে আহ্বান করেছিলেন। আমি তাঁকে সূর্য্যমুখী বীথির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবার সময় দেখবার উদ্দেশ্যে গন্ধরাজ কুঞ্জের অন্তরালে লুকিয়ে রইলাম।

শ্বেত মর্ম্মর জালের মধ্য দিয়ে যমুনার জল গোলকুণ্ডার হীরকখণ্ডের মতই বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছিল। মৃদু বাতাস আমার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়েছিল। আমি কি পদধ্বনি শুনছিলাম, না আমার বুকের ধ্বনি শুনছিলাম? কতকাল আমার সেই "বিরাট মহান" পুরুষ সমাধির মানব অপেক্ষাও আমার নিকট মৃত-তর ছিল। কিন্তু আমার নিকট যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসনের সাহায্যকল্পে দৌলতাবাদ ও গুলবরগার রণক্ষেত্রে সেই রাজপুতের বিজয়কাহিনী শোনাত, আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। আমার মনে হ'ত যেন আমিও বিজয়িনী, সেই বিজয়ী বীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছি! কিংবা কখনো ভীষণ হতাশাক্রান্ত হয়ে যেতাম, মনে হ'ত যেন তাঁর শত্রুর মত আমি নিষ্পেষিত হয়ে গেলাম।

মৃদু চন্দ্রালোকে বীণার সুর আমার অতীতের স্মৃতি সুপ্ত আত্মার মত জেগে উঠল আমার মধ্যে—যেমন তারা শেষ বিচারের দিন জেগে উঠবে ; অতীত আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল। আজকে আমার সব স্মৃতি কি বাস্তবের সংঘাতে প্রাণহীন ছায়াতে পর্য্যবসিত হবে ? আমার স্মৃতিও কি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ? অনেক দিন ত তিনি আমাদের পরম শত্রুর আদেশ পালন করেছেন ; এই তো সেদিন তিনি তাঁর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন—তাঁর নিজের প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন···।"

আমি মৃতের মত শীতল কঠোর হয়ে গেলাম। তারপর আমি প্রভাতের নীলাকাশের প্রচ্ছদপটে দেখলাম তাঁর শুভ্র উষ্ণীষ। অলৌকিক ঘটনাবলে মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার হ'লে মানুষ যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে, তেমনি আমার রক্তের স্রোত-প্রবাহে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সে রক্তের সঙ্গে ছিল আগুন। তাঁর আকৃতি অতীত দিনের মত সুঠাম ; বয়স তাঁর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত করে দিয়েছিল ; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ছিল পূর্ব্বের মত দীপ্তি। তাঁর অস্ত্রের ঝনঝনা শুনেছিলাম—তাঁর পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে গেল। প্রেমের আতিশয্যে ও হতাশার পীড়নে আমি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম—মুখের উপর অবগুণ্ঠন টেনে দিলাম। অতীত আমার বর্ত্তমানকে আচ্ছন্ন করে দিল। নিশীথে বহু দূরাগত ঐক্যতানের অবিস্মরণীয় সুরের মত মক্ষিকাকুল আমার কর্ণে ক্রন্দন ধ্বনি তুলেছিল ; নিমীলিত চক্ষু দিয়ে আমি সন্ধ্যা তারার উজ্জ্বলতা উপলব্ধি করেছিলাম। প্রত্যেকটি পুষ্প সুবাস-উচ্ছ্বসিত ; ঝরণার ধারা বয়ে চলেছিল অতি মৃদুগতি যেমন সেদিন ছিল—আজও···"

ঐ শোন ! একি বজ্রের ধ্বনি ! ঐ যে দূর থেকে আসছে ! এখন আমি তাঁর শেষ পত্রখানি পড়ছি। "মুঘল রাজকুমারীর আলেখ্য সংগ্রহের মধ্যে চৌহান রাজপুতের চিত্রপট শোভা পেতে পারে না।"

আমি আবেগে গাত্রোত্থান করলাম আমার শিরা রক্তস্রোত প্রবাহে স্ফীত হয়ে উঠেছে ; আমার মনে পড়ছে—আমার অন্তরে নৃত্য সুরু হয়েছিল ; সে নৃত্য যেন পর্ব্বতের শিখরের অভিমুখে চলেছিল।

আমার মনে পড়ে, আমি বহুদিন ঈশ্বরকে ভুলে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলাম ; বিষবৃক্ষের রসসিঞ্চন করে আমার ব্যথার প্রলেপ তৈরী করেছিলাম। আমি যাঁকে ভালবেসেছিলাম—তাঁকে আমি কি তীব্র ঘৃণা করেছি ! সেই অতিপরিচিত বীর ছিলেন অপরিচিততম, ভিন্ন রাজবংশের সন্তান। তিনি আমাকে সাহায্য না করে প্রতারণা করেছিলেন......।

মর্ম্মরতল অতিক্রম করে আমি দ্রুতপদে সামনে বুরুজের দিকে চলে গেলাম। যমুনা সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যমুনার জলতল ছিল সুশীতল। আমি যমুনার উচ্ছল জলতরঙ্গের দিকে হস্ত প্রসারিত করলাম। আঃ—আমি যদি সেই জলতরঙ্গে বিলীন হয়ে যেতাম !

এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফতেপুর শিকৃরীর দিকে অগ্রসর হ'লাম—শৈশবের পরে আর আমি শিকৃরীর পথে পদক্ষেপ করিনি। দ্রুতগামী অশ্ব লঘুভার শকটে সংযোজিত হয়েছিল—সে শকটটি সম্রাজ্ঞী নূরমহল ব্যবহার করতেন। আমার ভৃত্য 'হাজীর' আর আমার বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী 'কোয়েল' ভিন্ন আমার কোন সঙ্গী ছিল না।

সে দিন বাতাস ছিল উষ্ণ, মাঝে মাঝে ভীষণ উদ্দাম প্রভঞ্জন উষ্ণ বায়ুরাশিকে মথিত করে আসন্ন ঝড়ের আভাস দিচ্ছিল। আমরা গ্রাম অতিক্রম করে চলেছি। পথপার্শ্বে জনতা আমাদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, কারণ রাজপরিবারের সন্তান সাধারণতঃ শকটে আরোহণ করে না।

শকুনিকুল শবদেহের পার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বায়সকুল গোময়স্তূপের পার্শ্বে কর্কশ চীৎকার তুলেছিল। নির্জন পথে মাঠে ময়ূর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছিল। জলাভূমির পার্শ্বে পানকৌড়ী পক্ষ সঙ্কুচিত করে বসে ছিল।

অবশ্য এই সমস্ত দৃশ্য অপ্রত্যাশিত না হলেও বেশ একটু আশ্চর্য্যজনক। শুধু মনে হচ্ছিল জীবন্ত মানব পশু পক্ষী কেমন নির্ব্বিঘ্নে নিশ্বাস গ্রহণ করে। গভীর অস্বস্তিতে আমি কেবল তাই ভাবছিলাম। ধূলির মেঘের মধ্যে আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর তরোয়ালের চমক দেখেছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন তৈমুরের সৈন্যদল চলেছে—যারা তাঁর বিজয়ের পথ সুগম করেছিল ; তাদের অচ্ছেদ্য কৃষ্ণ বর্ম্মের শক্তিতে তারা বায়াজেদের (৩৫) বিংশ সহস্র কৃষ্ণবর্ম্মধারী সৈনিককে অক্লেশে ধ্বংস করেছিল।

হঠাৎ আমি এক অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করলাম, আঙ্গুরীবাগে যে দৃশ্য দেখে এসেছি, তা' যেন আমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠল এক তীব্র দৃঢ় সংকল্পে। আমি রাজপুতের হৃদয় জয় করব—পরিপূর্ণভাবে জয় করব। তিনি আমার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আবার শাহজাহানের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু জনশ্রুতি শুনছি, রাজপুতবীর নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করার উপক্রম করেছেন। তিনি কি সত্যই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন ?

কিন্তু জয়লাভ করা যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা দু'জনে সম্মিলিত হয়ে জয়লাভ করব। আমি আকবরের প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর শিকরীতে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করব। আমি অনেকদিন ভেবেছি যে, ফতেপুরে আমি তীর্থ যাত্রা করব। আমার মনে স্থির করেছি যে, সেখানে আমি তীর্থ যাত্রা করব। আমার নিশ্চিন্ত ধারণা যে, সেই বিরাট পুরুষ স্বয়ং বাহু তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন। সলিম চিশ্‌তীর সমাধির পাশে ফতেপুর—"বিজয়নগর"।

(৩৫) তুর্কী সুলতান বায়াজেদ তৈমুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন। তৈমুর সৈন্যদের ভূষণ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণকে মুঘল রাজগণ জয়ের প্রতীক বলে গণনা করতেন।

আমরা নহবৎখানার প্রস্তর মণ্ডিত অঙ্গনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনছি। এই নহবৎখানায় সম্রাট আকবরের বাদ্যকরগণ ফতেপুর শিকরীর পথে এই-স্থানে নানা সুরে তাঁকে অভিনন্দন জানাত। দ্রুতপদে আমি জুম্মা মস্‌জিদের পথে বিরাট শিলাতলে উপস্থিত হলাম। বুলন্দ্ দরওয়াজার (৩৬) মতন বিরাট তোরণ পৃথিবীর মধ্যে কি আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়? বিজয়ের পর সম্রাট আকবর এই বিরাট ত্রিতল তোরণ নির্ম্মাণ করেছিলেন।—এই তোরণ শুধু বিজয় স্তম্ভের পরিকল্পনার অংশমাত্র ছিল না—এই সুবিশাল শূন্যের ছায়ায় তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানের সঙ্কল্পও করেছিলেন।

প্রেমের সুরাধারায় ফতেপুর শিকরীর শিলাতল পরিধৌত করতে যদি পার্ত্তাম! আমি শুধু নগ্নপদক্ষেপে সেই তোরণের শিলাতল অতিক্রম করে এলাম।

যীশু বলেছিলেন—"এই জগৎ একটা সেতু মাত্র; সেই সেতু অতিক্রম কর, এখানে কোনো গৃহবাটিকা নির্ম্মাণ করো না। ইহজগতে যে একটি মুহূর্ত্ত নিষ্পাপ যাপন করে, সে অনন্তের সন্ধান পায়। এই জগৎ ত' অনন্তের একটি ক্ষণমাত্র। সেই ক্ষণটি ভক্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও। অবশিষ্ট সকলই মানবের অগোচর।"

এই শিরোনামাটি আরবী অক্ষরে তোরণ দ্বারে ক্ষোদিত আছে।

আমি অশ্বক্ষুরাকৃতি তোরণের মধ্য দিয়ে মসজিদে পদব্রজে প্রবেশ করলাম। সম্রাট আকবরের নগরে জগতের সমস্ত শব্দ নীরব হয়ে যায়। এই নগরটি চিরতরে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তবু যেন মনে হয় এই নগরটি মাত্র কালই রচিত হয়েছে। মনে হয়—জীবনের অদৃশ্য প্রস্রবণে পরিধৌত

(৩৬) বুলন্দ্ অর্থাৎ বৃহৎ। ফতেপুরের প্রাসাদ তোরণের নাম। এই তোরণের মধ্যে দিয়ে সাতটি হস্তী পাশাপাশি প্রবেশ কর্ত্তে পারে। এই তোরণের নির্ম্মাণ কৌশল অপূর্ব্ব।

আত্মাকে বরণ করবার জন্য সূর্য্য কিরণে স্নাত হয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম মন্দির প্রাঙ্গণটি আজও অপেক্ষা করছে।

এখানে বিরাট সুদীর্ঘ স্তম্ভগুলি সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত। কোথায়ও স্তম্ভগুলি প্রাচীরের ছিদ্র সংলগ্ন ছাদের সঙ্গে মিশে গেছে। স্তম্ভগুলির সম্মিলনে মধ্যভাগে একটি চতুষ্কোণ তৈরী হয়েছে, একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত দৃষ্টি মানুষকে অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়—শুভ্র রেশমবস্ত্রপরিহিত মানবের শোভাযাত্রা চলেছে। তারা দীন-ই-ইলাহি ধর্ম্মমত গ্রহণ করে স্তম্ভ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে নূতন দৃষ্টিতে জীবনের ও দর্শনের স্বপ্ন দেখছে। সে ত' বহু দিনের কাহিনী নয়, যখন শিক্ষার্থীর চরণক্ষেপে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি মুখরিত হয়ে উঠত! আজ সেখানে একমাত্র আমার চরণধ্বনি। এইখানেই স্তম্ভসংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফতেপুর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ফতেপুরের পুণ্য ভূমিতেই সম্রাট আকবরের উদার নীতির উন্মেষ হয়েছিল। সেই নীতি অনুসারে গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনের স্থান নির্দ্দেশ হয়েছিল কোরাণের উপর। দিন রাত্রি পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি ফতেপুরেই পারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

কিন্তু আজ আর সেখানে রাত্রিতে কোন আলো জ্বলে না, তরুণ জ্ঞানান্বেষী জ্ঞানের সন্ধানে মসজিদের মীনারে দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করে না, তাঁরা আজ জীবন সমস্যার সমাধানে নিভৃত আলোচনা করে না।

আমি সেই সমাধির নিকট উপস্থিত হলাম—পূজাবেদীর সানুদেশ অতিক্রম করলাম—তার অভ্যন্তরে ছিল স্তম্ভশীর্ষ প্রকোষ্ঠরাজি। নিখিল বিশ্বে এমন কোন ধর্ম্ম মন্দির আছে—যেখানে একজন মাত্র মানুষের চেষ্টায় অত অল্প সময়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে? 'সেই গম্বুজের নিম্নে বিরাট কক্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীর ও ছাদের ব্যবধানের

মধ্যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে ধরা পড়ে? একটু স্থান নেই সেখানে—কারুশিল্প, কারুকার্য্য, সূক্ষ্মচিত্র, মিনাশিল্প প্রভৃতি ভাস্কর্য্যের বিচিত্র সমন্বয় নাই।

কোথাও অসঙ্গতি নাই, একটি বর্ণ অন্য একটি বর্ণের সংস্পর্শে কোথাও বা কোমলতর কোথাও বা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। সেই শিল্প-নৈপুণ্য শিল্পীর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে আজও প্রদীপ জ্বলছে। আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতাম, কিন্তু হঠাৎ এক অপরূপ আনন্দের আবেশ এসে আমাকে অভিভূত করে দিল। আমি চিন্তা করলাম—সমরখন্দের দিলখুশ-প্রাসাদের কথা, সেই প্রাসাদেই ছিল মৃত্যুহীন তৈমুরের আবাস। সেই প্রাসাদের কথাই বাদশাহ বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন; ইরাণ দেশে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই কাহিনী আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল—প্রাচীরগাত্রে বিচিত্র পুষ্পের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হ'ল, প্রাচীর গাত্রে খোদিত কোরাণের আরবী অক্ষরগুলি জীবন্ত ফুলের মতন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগল।

আমার আগমনের বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। সমাধির সম্মুখে নিষেধ সত্ত্বেও বহু ভিক্ষুক এসে উপস্থিত হ'ল। একজন সুদর্শন যুবক, তার নয়নে উন্মাদ দৃষ্টি; সে ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠল—"আল্লাহু আকবর!" সে ধ্বনি গম্বুজের শূন্যতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল—"আল্লাহু আকবর!" একটা তীব্র কম্পন আমার মেরুদণ্ডকে মথিত করে দিল—"আল্লাহু আকবর।" এই ধ্বনি যেন তৈমুরের বংশকে শ্লেষ করে গেল—সত্যিই আমরা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছিলাম।

আমি সমাধি অতিক্রম করে স্তম্ভ কক্ষে উপস্থিত হলাম। আমি কিন্তু হিন্দুস্থানের কথাই ভাবছিলাম—আর হিন্দু স্থপতির আদর্শানুযায়ী পরিকল্পিত সম্রাট আকবরের স্তম্ভগুলি নিরীক্ষণ করলাম। প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে চতুষ্পার্শ্বে পদ্মকোরকগুলি নীরব ভাষায় গৌতম বুদ্ধের জীবনকথাই

বলছিল। শাক্যমুনি বোধিতরু মূলে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সে সত্যই ত' একদা তৈমুরের চক্ষুতে অতি ক্ষীণ ছায়াসম্পাত করেছিল। তৈমুর বেগ শৈশবে কোন জীবন্ত প্রাণীকে আঘাত করেন নি, এমন কি একটি পিপীলিকাও পদদলিত করেন নি। একদিন সম্রাট আকবর মৃগয়ায় নির্গত হয়েছেন। বন্য পশু শিকার-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে—শিকারের তীব্র উন্মাদনা। অসংখ্য পশুর মৃত্যু আসন্ন—অকস্মাৎ সম্রাট অশ্ব সংযত করলেন; সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, আদেশ দিলেন—"আমার রাজ্যে জীব হত্যা নিষেধ—প্রত্যেক জীবের জীবনই পবিত্র।"

সেই দিনই এক অপরূপ সত্যের জ্যোতি সম্রাট আকবরকে উদ্ভাসিত করেছিল।

সমাধির অপর প্রান্তে এক গভীর ছায়াসমাচ্ছন্ন কোণে প্রার্থনাবেদীর পার্শ্বে মর্ম্মরতলে উপবেশন করলাম। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খর রৌদ্রে আমি ঘর্ম্মাক্ত হয়েছিলাম। আমার শিরায় ছিল উদ্বেগের চঞ্চলতা। আমি প্রাচীরের পার্শ্বে মাথা এলিয়ে দিলাম। ভাটা যেমন জোয়ারকে অনুসরণ করে, তেমনি আমার মধ্যেও বিশ্রান্তি এসে পড়ল, মনে হ'ল যেন একটি দেবদূত কক্ষ অতিক্রম করে গেল। নিদ্রা এবং জাগরণে আমি ক্রমশঃ গভীর ভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর দেখলাম যেন একটি উচ্চ পর্ব্বত শিখর। কোথায় যেন আমি এ জিনিষ দেখেছি। ক্রমশঃ সেই অস্পষ্ট জিনিষটি স্পষ্টতর হয়ে উঠে সরোবরের দিকে নত হয়ে পড়েছে। আমি দেখলাম পর্ব্বত গাত্রে একটি গহ্বর। তার পাশে গবাক্ষের আকারে একটি চতুষ্কোণ অর্গলের অনুরূপ পথ। সলিল-রেখান্তে প্রস্তরে খোদিত একটি অস্পষ্ট হস্তী, তার উপরিভাগে একটি মানুষ মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখতে পেলাম—অপূর্ব্ব এই ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত। সে মূর্ত্তি অচল—অথচ শূন্যে নিবদ্ধদৃষ্টি মূর্ত্তির পরম গম্ভীর ভাব সত্যিই আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

আবার পাষাণ গাত্রে আলো জ্বলে উঠল। আলোর শিখা সরোবরের জলে প্রতিফলিত হয়ে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল; মনে হ'ল যেন জলতলে একটি সোণার বৃত্ত অঙ্কিত করে দিয়েছে। একটি অশরীরী বাণী শুনতে পেলাম, "বহু দূরে বনে বসে আছেন একজন মহাঋষি ধ্যান নিমগ্ন। তার নয়নের অজ্ঞান-অঞ্জন দূরীভূত; তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষ যা' ভোগ ক'রে, যার জন্য সংগ্রাম করে, যার জন্য জীবনপাত করে, তার মূল্য কিছুই নেই। হে রাজকুমারী, সেই মহাপুরুষ পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎলাভ করেছেন—তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। সমস্ত সুর তাঁর কাছে একটিমাত্র ধ্বনিতে মিশে গেছে, সমস্ত বর্ণ বৈচিত্র্য একটি মাত্র আলোর শিখায় মিলে গেছে। সেই আলোর একটি শিখা তাঁর আত্মাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে—তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তির মধ্য দিয়ে আত্মার বিশালতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের যথার্থ সম্রাট...

আমি হঠাৎ সম্বিৎ লাভ করলাম—যেন একটি হস্ত আমার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করেছে। আমি অনুভব করলাম—আমার সূক্ষ্মদেহ সিংহল পরিদর্শন করে এসেছে। একবার আমি জলপথে সুরাট থেকে সিংহল গিয়েছিলাম,—অনুরাধাপুরে সেই ঋষির মর্ম্মর সৌধ অবলোকন করেছিলাম। কিন্তু আমি যে বাণী শুনেছিলাম, তা' স্পষ্টই শুনেছিলাম—তা এসেছিল আমার দিল্লীর গ্রীষ্মাবাস থেকে।

আমার স্বপ্ন জাগরণের বিহ্বলতায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম—আমার শরীর যেন সেখানে স্থাণুর মত ভূমি-নিবদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আমি অনুভব করলাম বনৌষধি নিঃসৃত একটা মৃদু নির্য্যাসের সুগন্ধ; প্রার্থনালয়ের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে রক্ষিত কাংস্যপাত্রোত্থিত তীব্র কৃষ্ণধূন-সার। তার অভ্যন্তরে দেখলাম একটি মনুষ্যাকৃতি জীব! আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—তারপরই দেখলাম, শীর্ণকায় মানুষটি রাজপ্রহরী কর্তৃক বিতাড়িত জনতার একজন। লোকটি

বোধ হয় জানত যে, সুবর্ণ পাত্র নিঃসৃত কস্তুরী অগুরু গন্ধ সম্রাট আকবরের ইবাদৎখানাকে (৩৭) আমোদিত করেছে। বোধ হয় তার উদ্দেশ্য ছিল, সে আমাকে সেই বনস্পতির অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষণ করে তৃপ্ত হবে। আমাদের পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ে দেখলাম তার নয়নে করুণ ব্যথা —এই বিষাদ কি তার অন্তরের রূপান্তরিত ব্যথা? তাকে আমার সর্ব্বোত্তম কঙ্কণটি উপহার দিলাম। ইবাদৎখানার বহির্ভাগে এসে আমার মনে খুব একটা তৃপ্তির ভাব এল—যেমন মেঘের কোলে সূর্য্য রশ্মি······

বিজয়িনীর গর্ব্বে আমি পথ চলতে লাগলাম, আমাদের যুদ্ধ জয়ের পরে রাখীবন্দ ভাইয়ের সাথে এই ফতেপুর শিক্রীতেই জীবন অতিবাহিত করব; এখানে তৌহিদ্-ই-ইলাহি (একেশ্বরবাদ) পুনরুজ্জীবিত হবে—সম্রাট আকবরের উদার মত আবার প্রচারিত হবে। আল্লাহর করুণা, সর্ব্বজীবে সমভাবে বর্ষিত হবে।

আমি গম্বুজের নিম্নে বৃহৎ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। আমি যে কেবল অতীতের বিষয়ই স্মরণ করেছিলাম তা' নয়, অন্ধকারতম গহ্বর থেকে আমার ভবিষ্যৎ আনন্দের আভাস পেলাম।

কিন্তু তখনও আমি প্রার্থনা করতে পারিনি। সুতরাং আমি স্থির করলাম, দ্বিপ্রহরের নমাজের জন্য অপেক্ষা করব। পরের দিনও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বিশ্রাম করব। রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদে রাত্রি বাস করব। রাজতোরণের পার্শ্বে আমার জন্য শকট অপেক্ষা করছিল। আমি শহরের প্রাচীন অংশে চলে গেলাম। প্রাচীনই আজ আমাকে নূতন আকর্ষণ করছিল।

---

(৩৭) ইবাদৎখানা—প্রার্থনালয়, ফতেপুর শিক্রীতে আকবরের ধর্ম্মসভা। প্রতি বৃহস্পতিবার সূর্য্যাস্ত থেকে শুক্রবার নমাজের পর পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন বসত। সেখানে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচিত হ'ত।

প্রথমে আমি মহল-ই-খাসের সম্মুখে নেমে দরবার প্রাঙ্গণ অতিক্রম করলাম। এক সময় ফতেপুর-শিকরী ছিল ভারতবর্ষের হৃদ্পিণ্ড, আর আমার সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাসাদটি ছিল ফতেপুর-শিক্রীর প্রাণ। এখানেই সেই মহাপুরুষ আকবর তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধু বীরবলের সঙ্গে বাস করতেন। এই প্রাসাদটি আমাকে হুমায়ুন বাদশাহের শিবির স্মরণ করিয়ে দিল—যেখানে আকবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে কোন রাজকীয় সম্পদ ছিল না। কেবল একটি কস্তুরীপূর্ণ পাত্র ছিল—সম্রাট হুমায়ুন সেই কস্তুরী তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বল্লেন :—

"আজ যেমন এই কস্তুরীর সৌরভ সমগ্র শিবিরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, তেমনি আমার পুত্রের খ্যাতি যেন পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক···

সম্রাট আকবরের সমাধি-প্রাসাদ ছিল ঐশ্বর্য্যময়, কিন্তু তাঁর রাজ-প্রাসাদ ছিল আড়ম্বর-বিহীন। প্রাসাদের মধ্যস্থলে ছিল সম্রাটের শয়নকক্ষ। সেই কক্ষের নাম ছিল 'খা-আব্-বাগ'—স্বপ্নপুরী।

'হাজীর' আমার মাথার উপরে আলোর আবরণ উন্মোচন করে দিল। আমি প্রাসাদের সম্মুখে শুভ্র সেতু অতিক্রম করে সরোবরের মধ্যস্থিত মর্ম্মর দ্বীপে উপস্থিত হলাম। ঝরণার জল-কল্লোল এখন কর্ণগোচর হয় না। কিন্তু তুর্কী-বেগমের প্রাসাদ এখনো জলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে; সেই অপ্সরা মহলে প্রত্যেকটি শ্বেত-প্রস্তর যেন ক্ষোদিত গজদন্ত। স্তম্ভ গাত্রে প্রাচীরে ক্ষোদিত রয়েছে সম্রাটের প্রিয় ফলসম্ভার—আঙ্গুর, বেদানা, তরমুজ···।

আজকে কেন ঐ জলাশয়ের সমস্ত পদার্থ, আমার কাছে স্পর্শায়ত্ত বাস্তব জিনিষের চেয়েও বাস্তব মনে হচ্ছে? এ মহলটি আমার অত্যন্ত আপন বলে বোধ হ'ল। আমি খুব দ্রুতপদে অগ্রসর হ'লাম, তারপর আরও দূর অতিক্রম করে স্বপনপুরীর পথে অগ্রসর হ'লাম। আমার মনে হ'ল, কে যেন আমার আশায় এখানে অপেক্ষা করছে। কে সেই মহাপুরুষ,

যিনি বৃহতের মধ্যে বৃহত্তম—যিনি দীনের প্রতি দয়াময়—যাঁর মণিবন্ধে রয়েছে কঙ্কণ…।

যদিও এই কক্ষটি আয়তনে ক্ষুদ্র, এর মধ্যে অতি অপরূপ বর্ণ-সামঞ্জস্য রয়েছে—বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ঐক্যতান বস্ত্রের সুরের মতন সুসঙ্গত। আমি শৈশবে এখানে প্রাচীর গাত্রে আটটি চিত্র দেখেছিলাম—তা এখানে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। একটি চিত্রে ছিল রক্তবসনপরিহিত বিরাট পুরুষ, তাঁর অধরপুটে নিবদ্ধ অঙ্গুলি। তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনীর নারী দূরের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কি যেন ইঙ্গিত করছিল ; আর একজন মানুষ চলেছে নগরকে পশ্চাতে ফেলে নৌকারোহণে‥ ‥। একটি শিশু আশ্চর্য্য হয়ে অনুসন্ধান করছে প্রাচীর গাত্রের নীল তোরণের অন্তরালে পিতামহের গচ্ছিত গুপ্তধন। সে রাজপ্রাসাদের দ্বারের উপরে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত পারসী কবিতার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করছিল :—

"এই দরজার ধূলিকণা হুরীর কালো চোখের সুরমা হয়ে উঠুক।
যারা দেবদূতের মতন শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে তোমার দরজায়,
তারা শুক্র তারকার মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ধূলিকণা স্পর্শ করে।"

*

শিশুটি কিন্তু গবাক্ষ গাত্রের উপর অঙ্কিত। চিত্রগুলি দেখে অধিকতর বিস্ময় বোধ করছিল। চৈনিক শিল্পরীতিতে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের একটি চিত্র রয়েছে। নীলাভ মন্দিরে স্থাপিত ছিল সেই মূর্ত্তিটি—রক্তবর্ণ-স্বর্ণাভ পরিচ্ছদ ভূষিত ; শিরে তাঁর ক্ষুদ্র একটি মুকুট। চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কতকগুলি নরমুণ্ড, কতিপয় খণ্ডিত নরদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—কোনটি পীতাভ রক্তবর্ণ, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি শুভ্র, কোনটি বা স্বর্ণপ্রভ, একটি নরমুণ্ড মুকুট শোভিত। আমার মনে হল যেন এই মূর্ত্তিটি স্বয়ং সম্রাট আকবরের প্রতিমূর্ত্তি—তার চারিদিকে রয়েছে পরাজিত শত্রু, পরপারের অভিযাত্রী ; এর বেশী কিছু ধারণা কর্ত্তে সাহস পাচ্ছি না। একটি চিত্রে রয়েছে—

শাহজাদা সলিম ও হিন্দু যোগী ৭৯ পৃঃ

একটি দেবদূত অন্ধকার গহ্বর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে—গহ্বরের মুখটি স্বল্প ক্ষোদিত প্রস্তর খণ্ড। একটু উপরে যুগল ময়ূর চিত্রিত। দেবদূতের মুকুট মুক্তাহার পরিশোভিত—পালকগুলি উর্দ্ধমুখী। দেবতার পক্ষদ্বয় তুষার শুভ্র—স্বর্গের বিহঙ্গমের মত সুন্দর। তার চঞ্চল পরিচ্ছদ স্বর্ণাভ নীল লোহিত,—কটিদেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র বিলম্বিত, তার বাহুবন্ধ একটি নবজাত শিশু। এই শিশু কি শাহজাদা সেলিম? সেলিম চিশ্‌তীর আশীর্ব্বাদে তাঁর জন্ম—জন্মের পূর্ব্বে সেই রাজকুমার এই পুণ্য গুহাভ্যন্তরে বাস করতেন। আজও আমার সেই বিশ্বাস অটল। কিন্তু ফতেপুর-শিক্‌রীর অতীতের স্মৃতির কথা ত কেউ আলোচনা করে না।

যদি আমার পিতামহ জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ না করতেন তবে কি সম্রাট আকবরের রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেত? আমার মস্তিষ্কে চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে—এই গৃহে চির নিদ্রায় শায়িত মহাপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করবার তাৎপর্য্য আমি উপলব্ধি করলাম।

হঠাৎ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে এক মৃদু করুণ গানের সুর। এই সুর কোথা হতে আসছে? স্বর্গলোক হতে সম্রাট আকবরের গায়কদের সুরের রেশ কি ভেসে আসছে? কোন অলৌকিক শক্তি যদি আমাকে সেই স্বর্গলোকের সঙ্গীত শোনবার শক্তি দিত! আমি আমার করতল দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করলাম—মনশ্চক্ষে দেখলাম যেন আমি আবার সেই যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি—যখন 'খা-আব-বাগ' প্রভাতে সঙ্গীত মুখরিত হয়ে উঠত, আর সন্ধ্যার পূত বাতাসে ভেসে আসত সুমধুর সঙ্গীত ধারা। সেই অসংখ্য সুমধুর বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীতের সুরে তান মিলিয়ে নিত। প্রভাতের প্রথমভাগে সঙ্গীত ছিল কোমল; দ্বিতীয়ভাগে বহু সুরের সংযোজনায় বহু বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে, করতালের কলরোলে একটি অপূর্ব্ব ঐক্যতান সঙ্গীত সৃষ্টি হ'ত! দিবসের শেষে যখন সম্রাট আকবরের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করা হ'ত, তখন সমস্ত সঙ্গীত হয়ে উঠত

মন্ত্রমুগ্ধ। জরথুষ্ট্রের উপাসনা মন্দিরে বহুবার হুত হয়ে পবিত্র অগ্নি যেমন উপাসকদের নয়নে দীপ্তি সঞ্চার করে, তেমনি সন্ধ্যার সঙ্গীত মানুষের কর্ণে করত আনন্দ সঞ্চার।

আমি অলিন্দের বাইরে এলাম, সঙ্গীত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সরোবরের পাশে অপেক্ষা করছিল একদল মানুষ—তাদের হাতে ছিল বাঁশী ও তার-যন্ত্র। তারা উত্তেজিত কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছিল। তাদের বিভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষগুলি পরস্পর মিশে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে চিনতে পেরেছিল। তার চোখে দীপ্তি ফুটে উঠল, এই সেই শীর্ণকায় ব্যক্তি। সে দলের অন্য লোক থেকে দূরে সরে গেল—তার বীণার ঝঙ্কার দিয়ে একটি গান আরম্ভ করল।

এই সুরই ত' তানসেনের অভিনন্দন; মেবারের রাণী মীরাবাইএর আত্মনিবেদন। মীরাবাই শৈশবেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ভালবেসেছিলেন, সেই ভালবাসা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ললাট আর কোন মানুষের সম্মুখে অবনমিত হয়নি...

সেই সঙ্গীত আমাকে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে গেল। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চিরবসন্তে গোপীগণের সম্মুখে বংশী বাদন করতেন। আমি সেখানে দেখলাম রূপসী মীরা দেবতার মূর্ত্তির সম্মুখের রহস্যময় নৃত্যের জন্য উৎসর্গিতা। মীরা তাঁর জীবনের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে মানব কৃষ্ণকে ভজনা করে তাহার বিনাশ নাই। এই শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুর অবতার—তিনি পৃথিবীর পাপের ভার লাঘবের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আলোক সকলের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু এই ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত মানুষটি কে? কি গম্ভীর দুঃখময় তার স্বর! ফতেপুরের বিষাদ-পুরীতে আমার পথ অতিক্রম করে সে

আমার স্বপ্নের মাঝে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে। সে কি আমাদের বংশেরই সন্তান, সে কি আমারই মতন একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ? (৩৭)

লোকটি মীরাবাইয়ের একটি কৃষ্ণ ভজন গেয়ে চলেছে। ক্রমশঃ তার সঙ্গীত আলোকময় হয়ে উঠল—সে সঙ্গীত আমার অন্তর মথিত করে দিল

আমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করেছি।
আমি আর রাজমহিষী নই, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছি।
তোমার দাসী মীরা—তোমার আশ্রয়প্রার্থিনী মীরা।
মীরা তার দেহ—তার মন তোমায় সমর্পণ করেছে।

* * * *

মীরাবাই শেষ জীবনে দ্বারকার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন—আমরণ আশ্রমবাসিনী। সেই মন্দির, মন্দিরের প্রদীপ, পুষ্পসম্ভার নিয়ে তিনি আমার মনশ্চক্ষুতে মূর্ত্ত হয়ে উঠলেন। আশ্চর্য্য এই নারী! মীরা দেবী সেখানে তাঁর 'কালোমাণিক'কে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

আজ মানুষ দেবতার সম্মুখে জীব-বলি দিচ্ছে—মীরার মূর্ত্তি দেবতার মূর্ত্তির বিপরীত দিকে স্থাপন করেছে। পুরুষোত্তম বংশীধারীর প্রেম ইহজগতে মীরাবাইকে তাপসী করেছে, পরজগতে নারায়ণীর আসন দান করেছে।

আমার রক্তের মধ্য দিয়ে অগ্নিশিখা ছুটে চলেছে। যদি অন্ধকার ভারতবর্ষকে সমাচ্ছন্ন করে, দারা পরাজিত হন, যদি আমার প্রিয়তম

---

(৩৭) খসরুর পুত্র দারবক্স্ সংসার ত্যাগ করে ফকির হয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন। বোধ হয় জাহানারা তাঁর গানের ইঙ্গিত করেছেন।

রাওএর মৃত্যু হয়, তবু আমি তাঁর স্মৃতি পূজা করব—তিনি আমার চির বসন্তোদ্যানের রাজা—তিনি আমার শ্রীকৃষ্ণ।

"দশ পঁচিশী" (৩৮) খেলা-ঘর অতিক্রম করে দেওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হলাম। বাদশাহ স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর আসনে বসে সতরঞ্চ খেলতেন। জীবন্ত ক্রীতদাসী ছিল তাঁর সতরঞ্চের চলন্ত ঘুটি। আমি সশ্রদ্ধ ভীত মনে সেই কল্পলোকের প্রাসাদের সুমুখে দাঁড়ালাম : ভাবলাম —অতীতে কি ঐশ্বর্য্যের বিলাস ছিল এই স্থানে!

দেওয়ান-ই-খাসের শ্রেণীবদ্ধ গবাক্ষের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করলে ধারণা হয় প্রাসাদটি দ্বিতল ; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে একটি বিরাট কক্ষ। আমি গবাক্ষ প্রান্তে বিশ্রাম করলাম ; স্থানটি সুশীতল। সেই সঙ্গীতের রেশ তখনও আমার কানে আসছিল—আমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে যেন আমি ভারতের সেই পবিত্র মন্দির রক্ষা করছিলাম, কারণ দানব সে মন্দির অধিকার কর্ত্তে চেয়েছিল।

কক্ষের মধ্যস্থলে স্তম্ভটি অপূর্ব্ব—মনে হয় যেন প্রকাণ্ড পুষ্পের মৃণাল। কক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল সম্রাট আকবরের রাজসিংহাসন। আমার কল্পনায় প্রতিভাত হ'ল স্তম্ভটি বিরাট বিশ্ববৃক্ষের কাণ্ড। সে বৃক্ষের পত্রপল্লব ছিল অসীম শূন্য, তার ফল সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা। মেরুপর্ব্বত শীর্ষে সেই বৃক্ষটি পরিণত হ'ল—জ্ঞানবৃক্ষে, তার পার্শ্বে বিষ্ণু দেবতার অপরূপ স্তম্ভ। মেরু শিখরে সমাসীন ছিল দেবতার প্রতীক।

সম্রাট আকবরই ভারতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেছেন, তিনিই তৈমুরের রাজবংশকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন।

আমি উপরের গবাক্ষ দিয়ে প্রাচীরের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আসনগুলির দিকে দেখলাম। আমার মনে হ'ল যেন সিংহাসনের পার্শ্বে সমাসীন অম্বররাজ বিহারীমল। তাঁরই কন্যা যোধবাঈএর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল

(৩৮) আকবর মহিষীদের সঙ্গে এই প্রাঙ্গণে কড়ি খেলতেন।

সম্রাটের ; তিনিই ত' জাহাঙ্গীরের জননী। আরও একজন দেখলাম বীর সেনাপতি রাজা মানসিংহ—তিনি তৈমুর বংশের ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার জন্য কত যুদ্ধ জয় করেছিলেন।

মধ্যস্থলের স্তম্ভকে কেন্দ্র করে চতুষ্ক নির্মাণ করা হয়েছে। সৃজনী শক্তির প্রতীক চতুর্দ্দিকবিসর্পী সেতুচতুষ্টয়ও নির্ম্মিত হয়েছিল। আমি যেন দেখলাম—সম্রাটের অমাত্যগণ তাঁর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন—প্রথমে টোডরমল, সেই সাহসী বীর, যোদ্ধা ও কোষাধ্যক্ষ ; তাঁর চেষ্টায় সমস্ত দরিদ্র প্রজা শস্য কর্ত্তনের সময়ে সুবিচার লাভ করত। তারপর দেখলাম সম্রাটের প্রিয় বয়স্য রাজা বীরবল। তাঁর সুতীব্র পরিহাসগুলি এখনো আমাদের শ্রবণকে আনন্দ দেয়। হঠাৎ দেওয়ান-ই-খাসের বিরাট প্রশান্তি অনুভব করলাম। প্রধান অমাত্য আবুল ফজলের আগমন—আবুল ফজল দীন্-ই-ইলাহী পরিকল্পনা করে অবশ্য বিশ্বব্যাপী অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন। কক্ষের দূরতম কোণ থেকে আমি অসন্তোষের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি * * *।

আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি সম্রাট আকবর অতীত দিনের মত বিচারাসনে দণ্ডায়মান—অতি বিনম্র বেশ, বিনীত রাজশ্রী। কিন্তু কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে অত্যাচারী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, পীড়িত জন আশ্রয়ের সন্ধান পায়। তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হয় আত্মার দীপ্তিশিখা। এই বিদেশী বংশজাত রাজপুত্রের রাজ্য সহস্র যোজনব্যাপী—পূর্ব্বে ঢাকা নগরী, পশ্চিমে কাবুল, উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে আহম্মদনগর। এই বিরাট রাজ্যের প্রজাবৃন্দের কল্যাণের জন্য তাঁর কি সদাজাগ্রত দৃষ্টি! বোধ হয় কোন 'গ্রামণীও' (৩৯) তার গ্রামবাসীর সুখ সুবিধার জন্য

(৩৯) "গ্রামণী" ভারতের গ্রামদেশে প্রত্যেক অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা ছিল। গ্রামবৃদ্ধ অথবা গ্রামণী গ্রামবাসীদের কল্যাণের জন্য দায়ী ছিল, সুতরাং তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি গ্রামবাসীদের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত ছিল।

অত উদ্বিগ্ন ছিল না। শিরা যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশে হৃদপিণ্ডের আধার থেকে রক্ত সঞ্চালন করে—তেমনি সম্রাটের আদেশ বহন করে সম্রাটের অমাত্যগণ দেশ শাসন করতেন। আমার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্-র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হউক—এই অভিপ্রায়ে সম্রাট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলিকে একত্র কর্ত্তে চেষ্টা করেছেন; সূর্য্যালোক যেমন পত্রের শিরায় শিরায় উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, সম্রাট আকবরও তেমনি সমস্ত রাজ্যের প্রতি অংশে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। সুতরাং রাজ্যের প্রজাকুল বিশ্বপালক বিষ্ণুর স্থলাভিষিক্ত শাসক আকবরের সম্মুখে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্ঘ্য প্রদান করত। যদিও জিজিয়া কর উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তবু সম্রাটের রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল।

আল্লাহ্-র প্রতিনিধি সম্রাট আকবর ঘোষণা করেছিলেন, "মানুষের অন্তর সহস্র পথে তার লক্ষ্যের সন্ধান করে।" সেই শক্তিমান সম্রাট প্রত্যেক মানুষকে এই সত্য প্রমাণ করবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। সেই দিন কোণারকের সূর্য্য মন্দিরে, আবু পর্ব্বতের জৈনমন্দিরে, অজন্তা এলোরার গুহাভ্যন্তরে প্রস্তর নির্মিত দেবমূর্ত্তিগুলি কি জীবন্ত হয়ে ওঠে নি? সমস্ত দেশব্যাপী অসংখ্য দেবতার গৃহে কি মানুষ মস্তক অবনত করে এই সত্য প্রচার করে না? যখন অসংখ্য তীর্থযাত্রী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী সলিলে অবগাহন করে আত্মশুদ্ধি করতে আসত—তখন তাদের সঙ্গীতে সম্রাটের প্রার্থনার সুর মিশে যেত না?

আমি সেই সুদূর অতীতের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কিসের দীপ্তি—কিসের ঔজ্জ্বল্য দেখছি? আমি দেখছি দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন অষ্টপ্রহর খোজাপ্রহরী বেষ্টিত। আমার কল্পনায় ভেসে আসছে আমার সম্রাট-পিতা তাঁর পূর্ব্ব গৌরবের ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন, বিরাট চন্দ্রাতপের নিয়ে দ্বাদশ স্তম্ভ থেকে স্ফুরিত হচ্ছে সহস্র প্রস্তরের উজ্জ্বল আভা। না, না, সেই আভা যে সিংহাসনেরই দীপ্তি! তারপর আমি দেখলাম যেন

তানসেন ৮৫ পৃঃ

সম্রাট একটি পিঞ্জরে আবদ্ধ ; তৈমুর বায়াজিদকে যে পিঞ্জরে বন্দী করেছিলেন। সে'ত এই পিঞ্জরের চেয়ে কম ভীষণ নয়।

কিন্তু ফতেপুর শিকৃরীতে ছিল বিশ্ব-কল্পদ্রুম।

যখন 'হাজির' পুনরায় আমার উপরে আলোর আবরণ উন্মোচন করে দিল—আমার মনে হল আগ্রা বহুদূর। অতীত আমার বর্ত্তমানে পরিণত হল। ভবিষ্যৎ মনে হল আমার মাত্র আর একটি দিন—অর্থাৎ আগামীকাল। ঐ শোন, নহবৎখানায় তানসেনের সুমধুর সুর বেজে উঠেছে ; সেই সুর দারা শুকোকে অভিনন্দন করবে—দারা চলেছেন ফতেপুরে, তিনি তাঁর প্রথম দরবার উদ্বোধন করবেন।

মহল-ই-খাসের মহিলা বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে আমি রাজপথের উপর এলাম। পথগুলি প্রশস্ত, প্রত্যেকটি পথ প্রাসাদলগ্ন, কিন্তু প্রত্যেকটি পথের নিজস্ব রূপ আছে, একটি অন্যটি থেকে বিভিন্ন—ভীষণ তীব্র সূর্য্য কিরণে কোন প্রাণীই দৃষ্টিপথে পড়ে না—কিন্তু বাতাস যেন কি একটা আশঙ্কায় কম্পমান।

ঐ বিপরীত দিকে পাঁচমহল (৪০)। মনে হয় যেন প্রাসাদটি একটি সুললিত পদ্য ; প্রাসাদের পাঁচটি তল সুচিক্কণ ক্ষোদিত প্রস্তরস্তম্ভ দিয়ে নির্ম্মিত। সর্ব্বনিম্নতলে স্তম্ভের সংখ্যা ক্রমশঃ লঘু হয়ে গেছে। সর্ব্বশেষে একটা চন্দ্রাতপ ছিল চারিটি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত।

আমি অভিভূত ব্যক্তির মতন প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। প্রথম কক্ষে আমি দীন্-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের শিষ্যদের দেখলাম। তাদের মধ্যে অনেককে পূর্ব্বে দেওয়ান-ই-খাসে দেখেছিলাম। আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম পরস্পর গম্ভীর আলোচনা চলেছে। স্তম্ভ পার্শ্বে মাথার উপরে

---

(৪০) পাঁচমহল প্রাসাদ বৌদ্ধ বিহারের স্থপতি রীতি অনুসারে নির্ম্মিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ধর্ম্মসমন্বয়ের পটভূমিরূপে শিল্পসমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ছাদের নীচে ক্ষোদিত রয়েছে পুতপদ্মপুষ্প, নিম্নমুখী পুষ্পদল ছড়িয়ে রয়েছে—যেন ধরিত্রীকে বক্ষে ধারণ করে আছে। সম্রাট আকবর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন মানুষকে সংসার ত্যাগ করতে উপদেশ দেননি। প্রথম স্তরে দীন্-ই-ইলাহী ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ছিল যে, ইলাহী-শিষ্যগণ তাঁদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ সম্রাটকে নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

আমি দ্বিতীয় তলে আরোহণ করলাম—চিন্তা করলাম দ্বিতীয় স্তরের বিষয়; এই স্তরে ইলাহী-শিষ্যগণ সম্রাটের জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতেন। এই পার্থিব সাম্রাজ্য গঠনেরও প্রয়োজন আছে।

এখানে ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ আছে—কোন একটি অপরটির মতন নয় কি অপরূপ এই স্তম্ভবীথি—প্রত্যেক স্তম্ভ এক একটি নিজস্ব বাণী প্রচার করছে! আমি সুন্দরতম স্তম্ভটি বাহুপাশে আবদ্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ অমাত্যদের কথা ভাবলাম। আমি স্তম্ভটির পার্শ্বে আমার কপোল ন্যস্ত করলাম।

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষের ভিতর দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল। বাতাস আমাকে একটি আসন্ন বসন্ত পল্লব উপহার দিয়ে গেল। সেই পল্লবটি এসেছিল আমার কাছে অতীতের বার্ত্তার রূপ নিয়ে—আমার মধ্যে পুনরায় জীবনের তীব্র জ্বালা ফুটিয়ে তুল্ল। আমি শিলাতলে অস্থির পদক্ষেপ করতে লাগলাম। আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ ত' এই প্রাঙ্গণেই শৈশবের খেলা খেলেছি। সে দিনগুলি আমার স্পষ্ট মনে আছে—কেমন করে সেদিন দারা শুকো একটি ময়ূরপুচ্ছ তাঁর উষ্ণীষে জড়িয়ে বারম্বার শির সঞ্চালন করে 'রাজা-রাজা' খেলেছিলেন; আওরঙ্গজেব প্রাসাদের কোণে বসে বসে মালা সঞ্চালন করছিলেন। গোলাপী শাড়ী পরিধান করে আমার ছোট ছোট বোনগুলি স্তম্ভকে বেষ্টন করে লুকোচুরি খেলত।

আমি যে স্তম্ভটিকে আলিঙ্গন করেছিলাম—তার পাশে আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর দেখছিলাম…

এখনো যেন দেখলাম, একটা বিক্ষুব্ধ বাতাস দারার ময়ূর-পুচ্ছকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আওরঙ্গজেব বসে মালা হস্তে তাঁর মস্তক উত্তোলন করে দেখলেন—তাঁর দৃষ্টিতে ছিল তাচ্ছিল্যের হাসি। দারা দাঁড়িয়ে ছিলেন—বিহ্বল দৃষ্টি।

তখনও আমরা শিশু—আমাদের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা চিন্তা করিনি।

আমি অতীতের স্মৃতি আর বর্ত্তমানকে বিস্মৃত হবার জন্য তৃতীয় তলে চলে গেলাম। আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীব্র শিহরণ অনুভব করছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্রাট আকবরের ভারতবর্ষের জন্য জীবনপণ কর্ত্তে পারিনি। বিংশতি স্তম্ভের অন্তরালে আমি সমস্ত নগরের বিভিন্ন অংশ দেখলাম—অবশ্য তখন নগরে সামান্য অংশমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমি ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টি দিয়ে, অনেক কিছুই দেখলাম, কারণ আমি ফতেপুর সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণী পাঠ করেছিলাম। আমি চিত্রশালা নিরীক্ষণ করলাম, এইখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত ইলাহী-শিষ্যগণ সমবেত হয়েছিলেন—পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানী গুণী এসেছিলেন—এই নগরীর খ্যাতি গজনীর মত বিশ্ববিশ্রুত ছিল। ইলাহী-শিষ্যগণ সম্রাট আকবর ও আবুল ফজলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ইরাণীর চিত্রকর একমাত্র হিরাত ও সিরাজ থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন তা' নয়। খিলাফতের যুগের এবং প্রাচীন চীন দেশেরও অনেক চিত্র তাঁরা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এই চিত্রশালায় মহিমামণ্ডিত অতীত যুগের মূর্ত্তি এই সমস্ত তরুণ চিত্র-শিল্পীদের মনে এক অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তি সঞ্চার করেছিল। ভারতের পুষ্পসার থেকে সংগৃহীত রস দিয়ে তাঁরা চিত্রশালায় রঙের খেলার নবীন স্বপ্ন দেখতেন। নবীন চিত্রকর সৃষ্টি করল নিত্য নতুন অপরূপ প্রচ্ছদপট। তাদের কল্পনা তৈমুর রাজবংশের গ্রন্থাগারের সুবিখ্যাত প্রাচীন চিত্রাবলীর সমতুল।

কিন্তু হিন্দুরাই ছিলেন সর্ব্বোত্তম অঙ্কনশিল্পী—তাঁরা যেন তখনও অজন্তার গুহাপীঠে সমাসীন হয়ে তুলিকা-সম্পাতে বহির্জগতে জীবনের প্রাচীর রূপায়িত করছিলেন।

এবার মনে হচ্ছিল নগরীর কর্ম্মকোলাহল আমার কাণে ভেসে আসছে! আমি মুদ্রাশালা দেখলাম, সেখানে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম মুদ্রা বাদশাহের চিত্র সমন্বিত হয়ে তৈরী হ'ত। যন্ত্রগৃহ দেখলাম—তার মধ্যে রয়েছে সম্রাটের আবিষ্কৃত বৃহৎ কামানশ্রেণী।

শতাধিক যন্ত্রশালা দেখলাম—সেখানে সতরঞ্চের জন্য রেশমের উপর স্বর্ণ রৌপ্যের সূত্রমণ্ডিত ঝালর তৈরী করা হ'ত। অপূর্ব্ব লিপি সমন্বয় করে পুস্তক লিখিত হয়। প্রতিক্ষেত্রেই স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত আছেন—তিনি নিজেই সকল কাজের তত্ত্বাবধান করেন। সম্রাটের পরিমাণ চক্ষুর অগোচরে প্রাচীর গাত্রে কোন রেখা সম্পাত হ'ত না—অথবা কোন পুস্তক চিত্রালঙ্কৃত হ'ত না।

তারপর দেখলাম গ্রন্থাগার: সেখানে রয়েছে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত পাণ্ডুলিপি—তৈমুরের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি। সেগুলি বাদশাহ বাবর ইরাণ থেকে ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেখানে রয়েছে সম্রাট আকবরের ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব, গ্রীস, প্যালেষ্টাইন থেকে সংগৃহীত কাব্য ও দর্শন। অত গ্রন্থ তাঁর পূর্ব্বগামী অথবা পরবর্ত্তী কোন সম্রাটই সংগ্রহ কর্ত্তে পারেন নি। একখানি পুস্তক ছিল অপরূপ, সুন্দর, অলঙ্কৃত—তৈমুরের জীবনী ও বিধান; সেখানি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সে পুস্তকে আছে:—

"আমার স্বার্থের প্রয়োজনে আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন বা দানের মর্য্যাদা নষ্ট করি নাই এবং আত্মীয়দের বিনাশ করতে কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে আদেশ প্রচার করি নাই।"

রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক তলে দ্বারদেশে বিভিন্ন দেশের নৃপতিবৃন্দ

তৈমুরের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান থাকতেন। যখন তৈমুর বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর ছয়টি পৌত্রের বিবাহ উৎসব 'কানিবুল' (৪১) উদ্যানে সুসম্পন্ন করেছিলেন: পৃথিবীব্যাপী মুঘল সাম্রাজ্য তাঁর বংশধর দ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত থাকবে—এই কি তাঁর স্বপ্ন ছিল না?

তৈমুরের মতন রাজ্যজয়ের জন্য সম্রাট আকবর অসংখ্য দেশ ধ্বংস করেন নি। আকবরের অভিলাষ ছিল, ভারতবর্ষ শাব পুরাতন ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, দিল্লীর চতুষ্পার্শে তৈমুরের শেষ বংশধরগণ শান্তি-শিবির প্রতিষ্ঠিত করুক।

একটি বিরাট মহীরুহ সেই বীজ থেকে গড়ে উঠেছিল, তার শাখা-প্রশাখা কি এখন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে? সেই প্রকাণ্ড কাণ্ডটি পৃথিবীর বক্ষ থেকে লুপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত কি তার ফলগুলি নিরর্থক হয়ে যাবে? এই জন্য কি বাবর ভারতবর্ষে এসেছিলেন? আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আর একখানি গ্রন্থ অবলোকন করলাম,—"সর-ই-আস্‌রার" (৪২) বা বেদের জ্ঞানকাণ্ড। শাহজাদা দারা সেই পুস্তকখানি পারসীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। দীন্-ই-ইলাহী শিষ্যের উপযুক্ত কাজ বটে।

নিম্নতল থেকে পরিহাস-ব্যঞ্জক হাসি শুনলাম। আমি আওরঙ্গজেবের বিস্ফারিত দন্তপাটি দেখলাম—হিংস্র পশু তাঁর ভিতরে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তিনিই ত' দারাকে আখ্যা দিলেন—"রাফিজী" অর্থাৎ বিধর্ম্মী ধর্ম্মদ্রোহী, অবিশ্বাসী; তাঁকে পৌত্তলিক অপবাদ দিয়ে পৃথিবী থেকে অপসারিত কর্ত্তে হবে। উঃ, একথা আমি পূর্ব্বে বুঝিনি কেন?

দীন্-ই-ইলাহী শিষ্যগণ তৃতীয় গুরে সম্রাটের জন্য আত্মসম্মান নিবেদন করতেন। আত্মসম্মান ত' মানুষের নিকট তার প্রাণের অপেক্ষাও

(৪১) "কানিবুল" উদ্যান সমরখন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমোদ কানন।

(৪২) "সর্-ই-আস্‌রার" দারা শুকো সংকলিত উপনিষদের সার সংগ্রহ। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়েছিল। এই পুস্তকে হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের অপরূপ চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল্যবান। "সর্-ই-আস্‌সার" গ্রন্থে দারা সম্রাট আকবরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন—হে অদৃশ্য জগতের বিধাতা!

আল্লাহ্ আমার ভ্রাতার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুক।

আমি আরও উপরের তলে দ্বাদশ স্তম্ভের কক্ষে উপস্থিত হলাম।

চতুর্থ স্তরে দীন্-ই-ইলাহীর শিষ্যগণ বাদশাহের ধর্ম্ম অনুসরণ করতেন।

দ্বিপ্রহর নমাজের সময় হয়েছে, আমি নতজানু হয়ে যুক্তকরে উপবিষ্ট হলাম। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চল্ল। সম্রাট আকবর যে দিন থেকে ঈশ্বরের একত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হলেন, সেদিন থেকে জুম্মা মসজিদের নমাজের সময় ঘোষণার জন্য এই মুয়াজ্জিন অপেক্ষা করে থাকেন। তিনি সকলকে নমাজের জন্য আহ্বান করেন।

একটি আলোর শিখা আমাকে পরিবৃত করে ফেল্ল, আমার আত্মা সেই আলোকে অবগাহন করে নিল। আমি অনুভব করলাম—সম্রাট আকবরেব নয়ন কি ভাবে উন্মীলিত হয়েছিল।

সম্রাট আকবর শৈশবে অন্ধের মধ্য দিয়ে সত্য উপলব্ধি কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলেন। যৌবনে তিনি অভিষ্ট সন্ধানদাতা গুরুর সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ধারণা কর্ত্তে পারেন নি যে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপেই তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে ইবাদৎখানার উলেমা, ইমামদের দেখলাম; তাহার উষ্ণীষ ঝড়ের দোলায় সুবৃহৎ পুষ্পের মতন আন্দোলিত হচ্ছিল! এই সমস্ত জ্ঞানী শাস্ত্রের বিধান ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আতিশয্যের আবেগে পরস্পরকে ছিন্ন করে দিতেন। আমি দেখলাম—রাত্রিতে পণ্ডিত ও সুফিগণ সম্রাটের শয়নকক্ষের বারান্দায় দোলায় আন্দোলিত হচ্ছেন। দোলায় সমাসীন হয়ে নক্ষত্রের নীচে তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যাখ্যা সম্রাটের নিকট নিবেদন করতেন। তাঁরা বলেছিলেন—

"মানুষ নিজের চেষ্টায় যোগবলে নিজের শরীরকে সূক্ষ্ম অথবা (৪৩) বিদেহ করে হীরকের অণুর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারে অথবা দেহকে চন্দ্রগ্রহের প্রান্তদেশে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ নিজকে আলোর রেখার মধ্য দিয়ে ঊর্দ্ধলোকে নিয়ে যেতে পারে, অথবা ধরিত্রীর অন্তস্থলে বিলীন করে দিতে পারে, আবার ভেসে উপরে উঠতে পারে। যোগীর কাছে জল ও ভূমি সমান পদার্থ।"

আমি দেখলাম, তখনও সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, প্রভাতের আকাশ ক্রমশ: নীল পাংশু বর্ণ ধারণ করতে আরম্ভ করেছে—সম্রাট ফতেপুর শিক্রীর এক পরিত্যক্ত কোণে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর সমাসীন। নির্জ্জন নিশীথে চিন্তায় নিমগ্ন, সম্রাট সেই স্বপ্নলোক থেকে নির্গত হয়েছেন। প্রভাতের প্রথম বাতাস তাঁর শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছিল, কিন্তু জীবনের অপর পারেই মৃত্যু। তাঁর স্থূলদৃষ্টি বক্ষনিবদ্ধ, তাঁর আত্মার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। সেই রাজ্যে তিনি অভীষ্ট পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন।

অন্য কেউ বা উপলব্ধি করতে পারে সেই সত্য প্রস্তরোৎকীর্ণ অমলিন অক্ষরের মত সম্রাটের মনের উপর অঙ্কিত হয়ে উঠছিল। পৃথিবীতে কতকগুলি শাশ্বত বিধান আছে যা' মানুষের অলঙ্ঘ্য; এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ আছে, মানুষের ভাষা তা' প্রকাশ কর্ত্তে অক্ষম। সম্রাট যা' উপলব্ধি করেছিলেন আমিও আজ তাই উপলব্ধি করছি। সেই বিরাট এক, তারপর আর কিছু নাই।...

(৪৩) বাদায়ুনী বলেন, সম্রাট আক্‌বর হিন্দুযোগ এবং বৌদ্ধতন্ত্র আলোচনাও অভ্যাস করেছিলেন এবং কতগুলি অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। আমার দীন্-ই-ইলাহী গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছি। বাদায়ুনী বলেন যে, আকবরের বাসকক্ষের সম্মুখে একটি দোলনায় বসে সুফিগণ যোগাভ্যাস করতেন। পুরুষোত্তম এবং দেবী নামক দুইজন সাধক পুরুষ আকবরের যোগ চর্চ্চার সাহায্য করেছিলেন।

'একমেবাদ্বিতীয়ম'

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে—আমার চারিদিকে নীরবতা—একদা যেমন সেই প্রস্তর সমাসীন মহামানবের চারিপার্শ্বে ছিল। সম্রাট আকবরের অন্তরে ছিল এক বিরাট প্রশান্তি, আমি তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গ উপলব্ধি করলাম।

চারিটি স্তম্ভোপরি স্থাপিত পঞ্চম তলটি সম্রাটের সিংহাসনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে সেই বিরাট পুরুষ সমাসীন হয়ে নগর পরিদর্শন কর্ত্তেন, যেন বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়ে তাঁর বহুদিনব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে তিনি লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন।

আওরঙ্গজেব ৯২ পৃঃ

অষ্টম স্তবক

আমাদের মুঘলবংশ বহুদিন ভ্রাম্যমাণ ছিল। আমার সম্মুখে বিরাট প্রান্তরের অপরপ্রান্তে আমি দেখলাম, অনন্ত বন পথ, চাঘ্‌তাই (৪৪) পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছে পথরেখা ; শিবিরের পর শিবির স্থাপন করে চলেছে চাঘ্‌তাই জাতি—দলবদ্ধ, সঙ্গীতমুখরিত। নির্জ্জন গিরিবর্ম্ম অতিক্রম করে ফরগণার অধীশ্বর চলেছেন সমরখন্দের পুষ্প-শোভিত বনপথে ; যাযাবর জাতির মিলনকেন্দ্র তারিম সৈকত অতিক্রম করে তুহিন শীতল বায়ুর মধ্য দিয়ে মুঘলজাতি নতুন যাত্রা করেছে—অবশেষে মুঘলজাতি ভারতবর্ষের সীমান্তদেশে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত পৃথিবীজয়ের উদ্দেশ্যে সেই বিজয়ীদল পশ্চিমে ইউরোপ, পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত এসেছিল। সেই সোণালী শাখা (৪৫) ভারতে এসে তাদের শেষ শিবির স্থাপন করল।

দুর্দ্দমনীয় তেজ নিয়ে মুঘল বংশাবতংস বাবর এবং সম্রাট আকবর তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের অনুকরণে উদ্বেল তরঙ্গিণী সন্তরণ করেছিলেন। প্রাচীন যুগে মানুষ অতি দূরাগত ধ্বনি শুনতে পেত, অতি দূরের ক্ষুদ্রতম জিনিষের সন্ধান পেত। সম্রাট আকবর সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা চিত্রের অতি মৃদু রেখাসম্পাতের ছায়ার পার্থক্যও অনুভব কর্ত্তে পার্ত্তেন। বীণাঝঙ্কারে প্রতি স্বরের ব্যঞ্জনাও অনুধাবন কর্ত্তে পার্ত্তেন ; অবশ্য তাঁর সেই কঠিন হস্তে তিনি বন্য হস্তীও বশীভূত করেছিলেন।

(৪৪) চাঘ্‌তাই—এশিয়ার বনানীশোভিত পর্ব্বত উপত্যকা পথ।

(৪৫) মুঘল জাতির দুইটি শাখা। একটি "সোনালী শাখা" অপরটি "কৃষ্ণ শাখা" নামে ইতিহাসে পরিচিত। সোনালী শাখার সঙ্গে কোন জাতির রক্তের মিশ্রণ হয় নি। কৃষ্ণ শাখা নানা জাতির সঙ্গে মিশে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে।

সম্রাট আকবর বহির্জগতে ভারতের মহিমা প্রচার করেছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। সুবর্ণখচিত রাজবেশ, কৃষ্ণপ্রস্তর শোভিত কণ্ঠহার পরিধান করে সিংহাসনে আরোহণ কর্ত্তেন। তাতারদেশীয় রেশম ও চীনদেশীয় ঝালর সমন্বিত সতরঞ্চ তাঁর অভিষেক কক্ষে শোভা পেত। তাঁর একদিকে নিক্ষিপ্ত থাকত সুবর্ণ মুদ্রা, অন্যদিকে মুক্তারাশি তাঁর হস্ত থেকে বিভিন্ন দিকে ঝরে পড়ত সুবর্ণখণ্ড এবং মুক্তা। দিল্লীশ্বরের মস্তকোপরি বিস্তৃত চন্দ্রাতপ এবং নিম্নে দৃশ্য আর অদৃশ্য জগতের সম্মিলন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল।

গোলাপের পুষ্পদলের মত ফতেপুর শিক্‌রী ফুটে উঠেছিল—ধনে ধান্যে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ; সেইরূপ সমৃদ্ধি ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী উপভোগ করেনি।

অতীতের দিকে নিরীক্ষণ করে তিনি আদর্শ সন্ধান করেছিলেন, যদি তিনি তাঁর অপেক্ষা উপযুক্ত শাসকের সন্ধান পেতেন তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ কর্ত্তে দ্বিধাবোধ কর্ত্তেন না। তিনি মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ দর্শন কর্ত্তে পারতেন। চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে আত্মসমাহিত, গায়ক আরও সুমিষ্ট সুর সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর মনশ্চক্ষুতে জগতের পর জগৎ প্রতিভাত হয়ে উঠছিল।

অতীতের স্মৃতি ও কল্পনার ভবিষ্যতের মিলন স্থলে সম্রাট সমাসীন। আমি সুদূর অতীতে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম, দেখলাম সেই বিরাট পুরুষ তৈমুর বেগ—শক্তির প্রাচুর্য্যে যিনি পৃথিবীকে মনের মতন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনের অনুকরণে মানুষ গঠিত না হলে তিনি মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার কর্ত্তেন না। অথচ তিনি নিজকে মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিশ্বাসীদের অধিনায়ক বলে ধারণা করেছিলেন।

সম্রাট আকবর অর্থ দিয়ে অথবা তরবারি দিয়ে কোন লোককে তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রলুব্ধ করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল—শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন

ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছেন, প্রত্যেক দেশেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ আছেন। যে ব্যক্তি মহাপুরুষকে অনুসরণ করেন—সে ব্যক্তি তাঁর সমতুল।

তৈমুরের পথ নরমুণ্ডের পাহাড়ের উপর দিয়ে রচিত হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট আকবর যখন প্রজাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'তেন—প্রজারা আসত তাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে, তাদের মুখে ফুটে উঠত প্রার্থনার সুর।

আর একবার আমি নগরের কোলাহল শুনতে পেলাম,—মনে হ'ল অতীত যেন নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। লোকজন বিরাট অবগাহনান্তে স্নান প্রাসাদ হ'তে নির্গত হচ্ছে। এই প্রাসাদের বহিরাভরণ খুবই সাধারণ; কিন্তু গম্বুজাকৃতি ছাদটি ছিল অপরূপ, শিলাতল ছিল মিনাশিল্পখচিত। আমি দেখেছি তারা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আসছে, কূপের পার্শ্বে শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় শান্তি আশ্রয় লাভ করবে····।

অনাথ আশ্রমের (৪৬) চারিপার্শ্বে বহু বুভুক্ষু সমবেত—যোগীদের জন্য অন্য আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি কল্পনার নেত্রে অবলোকন করলাম—আমিও যেন তাঁদের একজন। বৎসরের একটি বিশেষ দিনে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে এই আশ্রমে সাধুগণ সমবেত হ'তেন—সম্রাট বিশিষ্ট সাধুদের সঙ্গে একত্র ভোজন কর্ত্তেন।

একটি মৃদু বাতাসের দোলায় আমার অবগুণ্ঠন শ্লথ হয়ে গেল। কোয়েলের বিচ্ছুরিত গোলাপজল সমীরণ সুগন্ধ করে দিল। আমার স্মৃতিপটে জেগে উঠ্‌ল মিরিয়ম জমানীর (৪৭) গোলাপবীথির সুমধুর

(৪৬) **খয়রাতপুরা—অনাথ আশ্রম। আকবর সন্ন্যাসীদের জন্য যোগীপুরা, ভিক্ষুকদের জন্য খয়রাতপুরা এবং বারাঙ্গনাদের জন্য শয়তানপুরা সৃষ্টি করে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন আবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।**

(৪৭) **মিরিয়ম জমানী যুগ-মাতা আকবরের প্রধানা হিন্দু মহিষী বিহারীমলের কন্যা।**

গন্ধ। আমি উদ্যানবেষ্টিত অন্তঃপুরের মহিলা প্রাসাদগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। বৃহত্তম প্রাসাদটি সম্রাট তাঁহার ভারতীয় মহিষীদের জন্য ভারতীয় স্থপতি রীতিতে নির্ম্মাণ করেছিলেন, উদ্দেশ্য—তাঁরা যেন সেই প্রাসাদকে নিজস্ব বলে গ্রহণ কর্ত্তে পারেন। তাঁর প্রবেশ পথের পার্শ্বেই ছিল একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে আমি সূর্য্যাস্তে ভজনরত সম্রাটকে দেখলাম। চারণগণ অস্তায়মান সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে সম্রাটের স্তবগান করছিলেন। স্বর্ণ রোপ্য নির্ম্মিত দীপাধারে দ্বাদশ প্রদীপ জ্বলে উঠল—মধ্যস্থলে একটি অতি বৃহৎ শুভ্র প্রদীপ জ্বলছিল— প্রাসাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডায়মান—কারণ পৃথিবীতে অগ্নিই ভগবানের প্রতীক। প্রদীপশিখাই ভগবানের দৃষ্টির আলোক। সেই প্রাসাদগুলির মধ্যে আমি "স্বর্ণ মহল"ও দেখলাম—আর দেখলাম সুন্দর ক্ষুদ্র প্রাসাদ— আমি সেখানেই বিশ্রামের জন্য যাচ্ছি।

আমি একটি স্তম্ভের পার্শ্বে মস্তকবিন্যস্ত করে শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—সূর্য্যালোকে সমুদ্রের মতন প্রসারিত সুবিশাল প্রান্তর আমার দৃষ্টির সম্মুখে। আমি দেখছি অশ্ব হস্তীযূথ প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছে, শূন্যে ধুলিকণা উড়ছে। আজ যে বিরাট এক উৎসবের দিন। প্রীতি, বিশ্বাস এবং বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস ও উল্লাসে সম্রাট আকবর ফতেপুর শিকৃরীর পরিকল্পনা করেছিলেন (৪৮):—

এই মহিলা মুসলমানের স্ত্রী হয়েও হিন্দুর সমস্ত আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর্ত্তেন: তাঁর গৃহে তুলসী, হোমকুণ্ড, গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ছিল এবং ব্রাহ্মণ পাচক ছিল। তাঁর কিঙ্করী ছিল হিন্দু। উদার আকবর পত্নীর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করেন নি।

(৪৮) আকবরের দুই পুত্র শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারপর ফতেপুরের সুফী গুরু সলিম চিশ্‌তীর আশীর্ব্বাদে যোধবাঈ-এর গর্ভে আকবরের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সে পুত্র সন্তান যোধবাঈ প্রসব করেন সলিম চশ্‌তীর ক্ষুদ্র কুটীরে। সলিম আশীর্ব্বাদ জাত সন্তান বলে কৃতজ্ঞচিত্তে আকবর সেই সন্তানের নাম দিলেন সলিম। সলিম চিশ্‌তীর

মুঘল অন্তঃপুরিকার শিবপূজা ৯৬ পৃঃ

* * *

সংগ্রামে উৎসবে প্রেমে ও ঘৃণায়
সুরা ও শোণিতের উদ্বেলিত জ্বালায়

* * *

তবে কেন, সম্রাট ফতেপুর পরিত্যাগ করেছিলেন? কেন তাঁর সমস্ত শ্রম বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিয়ে দিলেন? আজ কেন সেই মর্ম্মরের স্বপ্নসৌধ ভিক্ষুক আর শ্বাপদের আবাস? দূরে, বহুদূরে সেকেন্দ্রার দিকে দেখলাম, প্রস্তরের উপরে কুজ্ঝটিকা গাঢ়তর প্রতিভাত হচ্ছিল। সমাধি ও শহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বৃক্ষগুলি যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাটের সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে প্রজ্বলিত ধূপাধার থেকে উত্থিত ধূম্রজাল কুজ্ঝটিকায় পরিণত হচ্ছে। সেই বিরাট পুরুষ আমার সম্মুখে প্রতিভাত হলেন—তিনি যে শাশ্বত পরিব্রাজক। কোন শিবিরই তাঁর অবাধগতি প্রতিরোধ করতে পারে নি। এমন কি সমাধিও তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে নি।

তাঁর সমস্ত উল্লাস কি শীতল হয়ে গেছে? মহাপুরুষ সেলিম চিশ্‌তীর অনুগ্রহজাত সন্তান সেলিম ত' আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই সন্তানের বিদ্রোহ জয় কি পিতার কাছে খুব বৃহৎ উল্লাসের ব্যাপার ছিল।

আমি সেই প্রহেলিকা-জাল ছিন্ন করতে যতই চেষ্টা করতাম, ততই তিনি আমার নিকটতর হয়ে উঠছিলেন। আমি তাঁর সম্মুখে শপথ করলাম, "যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি, তবে আবার সম্রাট আকবরের

কুটীরের পার্শ্বে স্বপ্ন দেখলেন বিরাট সৌধ, পরিকল্পনা করলেন এক নতুন নগর। সেই ছিল মুঘল সম্রাট আকবরের রাজধানী ফতেপুর শিক্রী। অকস্মাৎ আঠার বৎসর পরে আকবর সেই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী ফতেপুর শিক্রী পরিত্যাগ করেন। জাহানারা সেই পরিত্যক্ত নগরীর জন্য আক্ষেপ করছেন।

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ ফতেপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, জুম্মা মসজিদে পুনরায় প্রার্থনার ব্যবস্থা আরম্ভ করব, জ্ঞানপিপাসু তরুণদল পুনরায় ইবাদৎ-খানার গবেষণাগারে নক্ষত্রমণ্ডলী পরীক্ষা করবে, রাজপ্রাসাদে পুনরায় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

সোনহারা প্রাসাদের (৪৯) প্রবেশ তোরণে এসেছি। এইখানে আমি নবজীবন লাভ করব—এখানেই আমি প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে আমার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাব। মনে হচ্ছিল যেন শুদ্ধতম ধাতুর সুমিষ্টতম গন্ধ এই প্রাসাদ থেকে নির্গত হ'চ্ছে, স্বর্ণের উজ্জ্বলতা তার অন্তরে বাহিরে। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুবর্ণমণ্ডিত চিত্রবন্ধনের জীবন্ত বর্ণ সমাবেশ মানুষকে মুগ্ধ করে। নীল পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে যুদ্ধের দৃশ্য, মৃগয়ার দৃশ্য! রক্তবর্ণ বৃক্ষে বিভিন্ন বর্ণের রোমরাজি বিভূষিত বিহঙ্গম; স্তম্ভের কলুঙ্গিতে ক্ষোদিত রয়েছে—পদ্মাসনে সমাসীন বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র।

দরজার সম্মুখে একটি চিত্র অবলোকন করছিলাম। শৈশবে এই চিত্রটি আমার মনে একটি চিন্তার লহরী তুলত, সেই স্মৃতি আমায় প্রলুব্ধ করল। একটি দেবদূত—তাঁর হাতে ছিল খড়্গাকৃতি একটি জিনিষ; খড়্গের ভিতর থেকে স্ফুরিত হচ্ছিল অপরূপ জ্যোতি। সেই শিশু কি দেবদূত জিব্রাইল? রাজমহিষী যোধবাই মিরিয়ম জননীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন? আমি কক্ষের দ্বারদেশে উপবেশন করলাম।

আমার চিন্তা অন্তঃপুরে মহিলামহল পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'ল। শুনেছিলাম সম্রাটের অন্তঃপুরে, পঞ্চ সহস্রাধিক মহিলা বাস কর্ত্তেন। এখনো আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদে ঘোষিত বাণী "এক ঈশ্বর, এক স্ত্রী।'

---

(৪৯) সোনহারা প্রাসাদ সত্যই বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিয়ে তৈরী হয়েছিল। আজ তা চিহ্নও নেই।

এক স্ত্রীর বেশী যে কামনা করে—সে তার নিজের সর্ব্বনাশের পথ রচনা করে (৫০)—এই ছিল সম্রাটের শেষ জীবনের উপলব্ধি। যদি ফতেপুরে আবার আমাদের বিজয় লাভ করি, আমি সেই সোন্‌হারা প্রাসাদে **একলিঙ্গের** মন্দির স্থাপন করব।

আমি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম—সেখানে কোয়েল আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই প্রাসাদের স্থপতি ও অলঙ্কার আমার একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, বালু-পাথরের একটা বিরাট ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অপেক্ষা করে আছি। প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ অপূর্ব্ব সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত—মনে হয় যেন এশিয়ার কল্পনা-জগৎ সম্রাট আক্‌বরের হিন্দু রাজ্যে এসে মূর্ত্ত হয়েছে; সে জগতে সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ভগবানের চরণে লীন হয়ে যায়—ভগবানের বাইরে অন্য কোন সত্তা নাই।

আমি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে উপরের তলে উঠলাম—এখানে দুইটি প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে মনে হ'ল যেন আমি স্বর্গরাজ্যে এসেছি, সেই আশ্রয়টি আমার জন্যে বহুকাল অপেক্ষা করেছিল।

একটি পারস্য দেশীয় সতরঞ্চ মেজের উপর বিস্তৃত ছিল। এককোণে সবুজ সোনালী কিংখাব মোড়ান কুশান ছিল। একটি তাকের উপর রক্ষিত ছিল বহুকাল বিস্মৃত একটি চর্ম্মনির্ম্মিত চিত্রাধার, একটি বীণা এবং একখানি ছুরিকা; সম্ভবতঃ আমার ভ্রাতা দারাই বোধ হয় এখানে সর্ব্বশেষ অতিথি ছিলেন। তিনি ভিন্ন আর কে এই চিত্র সংগ্রহ করতে পারে।

---

(৫০) বিবাহ সম্বন্ধে এক স্ত্রী নির্দ্দেশ করার জন্য বহু আঘাত সহ্য সম্রাট আক্‌বরকে করতে হয়েছিল; কারণ কোরাণে আছে ১, ২, ৩, ৪ স্ত্রী পর্য্যন্ত একসঙ্গে বিবাহ করা যায় মোট ১০টি (সুরাহ্‌ ৪ : ৩)। পরবর্ত্তী যুগে মোল্লারা অর্থ করলেন ১+২+৩+৪=১০টি। আবু বিন লায়লা অর্থ করলেন ১+(২+২)+(৩+৩)+(৪+৪)=১৯টি।

কোয়েল কতকগুলি শ্বেত হারদ্রাভ চম্পক পুষ্প একটা বৃহৎ মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করেছিল। পুষ্পগন্ধে সমস্ত বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। আমি বারান্দার মধ্যে বিশ্রাম নিলাম। এখানেও প্রাচীরগুলি খুব চমৎকার ক্ষোদিত। এই ভাস্কর্য্য মানুষের মনে একটা প্রশান্তি দান করে। আগ্রায় প্রাসাদের সমস্ত জিনিষের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার, মখমলের আবরণ, মূল্যবান প্রস্তরচ্ছটা ; কিন্তু এখানে সবই বালু-পাথরের সমাবেশ।

আমার মনে হ'ল, আমি আমার জীবনব্যাপী অস্বস্তির পরে স্বস্তির জন্য একটি স্তম্ভের উপরে শরীর এলিয়ে দিলাম।

কোয়েল আমার জন্য কিছু খাদ্য এনেছিল। আমি তাকে চিত্রটি এনে দিতে আদেশ করলাম। আমি দেখলাম চিত্রাধারের ছিন্ন পত্র-গুলিতে সম্রাট আকবরের সময় উৎকীর্ণ ছিল। অবশ্য সে চিত্রগুলির মধ্যে ভারতের কোন মহাকাব্যের দৃশ্য কিংবা কোন রাজকীয় ঘটনা অঙ্কিত ছিল না। ঐখানে চিত্রাধারের মধ্যে আছে পাল্কীবাহী চিত্রকর দশনাথের (৫১) অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র চিত্র। আমার মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে এই চিত্রখানি ছিল আমার নিকট একটা সুমহান আশীর্ব্বাদ। চিত্রটির প্রচ্ছদপটে ছিল উচ্চশির প্রাসাদ, তার চতুর্দ্দিকে রক্তিমাভ উজ্জ্বল পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত প্রাচীর। এই ঔজ্জ্বল্য কি আরাবল্লী পর্ব্বতমালার গাত্রে হরিদ্রাভ স্ফটিকের জ্যোতি? সন্ধ্যাকাশের ঈষৎ স্বর্ণাভ জ্যোতির মধ্যে আরাবল্লীর প্রভা বিলীন হয়ে গেল। একটি স্বল্প পরিসর পথ সরীসৃপ গতিতে প্রাসাদের দিকে চলে গেছে। সম্মুখভাগে একটি নারীর চিত্র—বোধ হয় কোন নববিবাহিতা

(৫১) দশনাথ একজন অতি দরিদ্র পাল্কী বেয়ারা হরিজন পুত্র। মথুরার মন্দির গাত্রে অঙ্গার দিয়ে একটি ছবি আঁকছিল। আক্‌বর তাকে দেখে ভবিষ্যৎ প্রতিভার সন্ধান পেলেন, দশনাথকে রাজপ্রাসাদে এনে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পরিশেষে দশনাথকে রাজ-শিল্পীর সম্মান দিলেন। আক্‌বরের লোক চিন্‌বার অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল।

বধূ—ঊর্দ্ধদিকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। সেই নয়নের জ্যোতি আমি আজও বিস্মৃত হতে পারিনি। তার ঊর্দ্ধোত্তোলিত দক্ষিণ বাহু বামহস্তের তরবারির দিকে প্রসারিত। তার পশ্চাতে সুসজ্জিত সৈন্যদল একটি চিতা রচনা করছিল। আমি আমার কোয়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোয়েল! তুমি ত' হিন্দু নারী—বলত এই চিত্রের বার্ত্তা কি?"

সে মুহূর্ত্ত মাত্র চিত্রটি নিরীক্ষণ করে আমার দিকে দেখল, তার অশ্রুপূর্ণ নয়নে এক অপূর্ব্ব প্রভা। কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে সে বল্ল :—

"এই চিত্রের নায়িকা কুমার দেবী (কুরাম্ দেবী)। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদা কুমার দেবী মন্‌ডোরের রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি রাজকুমারকে স্বামীত্বে বরণ করলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে অন্য রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেবেন স্থির করেছিলেন। মন্‌ডোরের রাজা কুমার দেবীর বিবাহ যাত্রার পথে আক্রমণ করলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল। কুমার দেবী স্বয়ং তরবারি দিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করে বরের পিতার নিকট উপহার প্রেরণ করলেন। অথচ তিনি বরের পিতাকে কখনো দেখেন নি। উপহারে লেখা ছিল—"এই ছিল আপনার পুত্রবধূ।" অবশিষ্ট সালঙ্কার দ্বিতীয় হস্তটি একজন সৈন্যকে দিয়ে ছিন্ন করিয়ে নিজের পিতাকে প্রেরণ করলেন, তারপর কুমার দেবী চিতায় আত্মাহুতি দিলেন। রাজকুমারী ছিলেন হিন্দুস্থানের নারী!"

কোয়েল চলে গেল—আমি একাকিনী। আমার কুশানে মস্তক অবনমিত করে রাখলাম। কুমার দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ আমার মনে পড়ল—সম্রাট আকবরের এই অন্তঃপুরে আমি একজন প্রবাসীমাত্র। সম্রাট আকবর মুঘল রক্তের সঙ্গে হিন্দুস্থানের রক্ত মিশ্রণের জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্থান হিন্দুর রয়ে গেল। আর মুঘল? হাঁ, মুঘল রয়ে গেল; নয় কি? এই ত হিন্দুস্থানের নারী, সে স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে স্বামীর সঙ্গে চিরমিলন লাভ

করবে, এই আশায় অবহেলায় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ কর্ত্তে পারে। সে নিশ্চয় তার সুখের অংশ ভাগিনী বিদেশিনী নারীকে ঘৃণা কর্ত্তেও জানে এবং তার সঙ্গে কখনো এক চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করবে না। সেই তার স্বামীর সন্তানের জননী—আমাকে সে ঘৃণা করবে—এই ত স্বাভাবিক।

চন্দ্রের বিহনে যেমন স্রোত বিপরীত গতিতে বয়ে যায়, দুঃখ-পীড়িত প্রেম অবলুপ্ত গৌরবে আমার মনও তেমন আমার অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আজকে তৈমুরের সেই যাযাবর সৈন্য বাহিনী কোথায়? আমার আত্মবিশ্বাসই বা কোথায়?

আমি ক্রন্দন করলাম—আমার মাতার মৃত্যুর পর আমি আর অমন ক্রন্দন করিনি। আমার মনে হ'ল আমার পদনিম্নে পৃথিবী অবস্থিত হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী যেন কোন ভীষণ আদেশের অপেক্ষা করছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ এবং আমার সমস্ত ভরসা আমার রাখীবন্দ্ ভাইয়ের উপর নির্ভর করছে।

আমি ক্রন্দন করতে করতে নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়লাম—হঠাৎ অশ্বপদ-ধ্বনিতে জেগে উঠলাম। আগ্রার পথের দিক থেকে সেই ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছিল, তারপর অকস্মাৎ সে ধ্বনি নীরব হয়ে গেল।

আবার আমি সম্রাট আকবরের মৃত নগরে নূতন জীবন অনুভব করলাম। আমি আশা করছিলাম, আমার কক্ষের প্রস্তর নির্ম্মিত ঘূর্ণ্যমান দরজা আমাকে পাশের প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাবে—আমার চক্ষের সম্মুখে সম্রাটকে দেখতে পাব।...

দ্রুতগামী অশ্বপদধ্বনি আমার শিরার রক্তকে চঞ্চল করে দিল—নিশ্চয় রাজপুতবাহিনী আবার ছুটে আসছে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্য। রাজস্থানের নারীরাই রাজপুতবীরপ্রসবিনী। কোয়েল বলেছিল, "আমি এখনো সুন্দরী রয়েছি যেমন আমি ছিলাম আমার যৌবনে! সত্যি কি তাই?"

আমি চিত্রাধারের জন্য হস্ত প্রসারিত করলাম। চিত্রাধারটি আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছিল। আমি চিত্রাধার খুললাম—আর একটি চিত্র আমার দৃষ্টি পথে এল। সেই চিত্রে ছিল—শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে একাকী তাঁহার সহস্র গোপিনর সম্মুখে উপস্থিত। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা, কালিন্দীর উপরে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামার সাথে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ; যে তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে সেইরূপে উপস্থিত হন। (৫২) চিত্রের নিম্নে ক্ষোদিত রয়েছে :—

"তোমার দাসকে তুমি দরিদ্রতর কর।
কারণ, দরিদ্র যে তোমাকে নিত্য স্মরণ করে!"

কোয়েল আমার জন্য একখানি মুকুর, কিছু গুগ্‌গুল্‌ এবং নখের জন্য রক্তচন্দন রেখে গিয়েছিল যেন আমি বিবাহ উৎসবের আমন্ত্রণে যাব। অবশ্য ফতেপুরের সমাধিতে গিয়ে সেলিম চিশ্‌তীর সমাধি দর্শন করব। আমি আমার সমস্ত মণিমুক্তা রেখে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে ছিল মাত্র একটি মুক্তাহার, তার মধ্যে রক্ষিত ছিল কবচ, কবচের মধ্যে ছিল সেই পত্রখানি। আমি অতি দীনের মত সেই মহাপুরুষের কাছে যাব, তাঁর না ছিল মণি-মুক্তা, না ছিল পার্থিব সম্পদ—কিন্তু তাঁর ছিল অলৌকিক ক্ষমতা—বন্য পশুকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন, মানুষকে তিনি আকর্ষণ করতেন।

"আল্লাহ! তোমার দাসকে তুমি দরিদ্রতর কর।" সেলিম চিশ্‌তীর দারিদ্র্যই কি সম্রাটকে ফতেপুর শিক্‌রী নির্ম্মাণ করার প্রেরণা দিয়েছিল? দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত শক্তি—তা' কি সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী? আমি আমার চতুষ্পার্শ্বে নিরীক্ষণ করে দেখলাম, এখানে এখনো সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাব বিদ্যমান।

আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেব টুপী তৈরী করতেন; ফকীরের মতন তিনি টুপী বিক্রয় করতেন; তাঁর ক্ষমতার প্রতি লোভ ছিল। কিন্তু সৌন্দর্য্য

(৫২) জাহানারার হিন্দু শাস্ত্র ও উপাখ্যানের জ্ঞান অতি গভীর ও ব্যাপক।

দেখলে আওরঙ্গজেব অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন? আমার পিতার ছিল সৌন্দর্য্য-প্রীতি; তিনি সম্রাট আকবরের চেয়েও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; আজ যদি তাঁর সেই পূর্ব্বের ক্ষমতা থাকত! আমি আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করে রুগ্ন মানুষের মধ্যে বহু হস্তী অশ্ব বিলিয়ে দেব—তারা মসজিদে মন্দিরে প্রার্থনার জন্য আসবে। আমি ক্রীতদাস দাসীদের মুক্তি দেব, দশ সহস্র "দিনার" (৫৩) দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আমার দানে পিতার পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে।

আমি জুম্মা মসজিদের দিকে গেলাম। তারপর উজীর আবুল ফজল ও তাঁর ভ্রাতা ফৈজীর অনাড়ম্বর গৃহ বাটিকাতে উপস্থিত হলাম। সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ও তাঁর দীন্-ই-ইলাহী এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট কত ঋণী! আমি মৃদু চরণে চলেছি, আমার মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়েছিল। আমি ফৈজীর ক্ষুদ্র গৃহের সোপানশ্রেণী আরোহণ করলাম, মনে হ'ল যেন সেই রাজকবি তাঁর সম্রাটের সম্মুখে আবৃত্তি করছেন—শ্রীকৃষ্ণের কোনও কাহিনী, অথবা নাসীর-ই-খসরুর কোন কবিতা :—

সমুদ্রের মত সুবিশাল শাস্ত্রের বিধান।
মুক্তার মত ঋষির অন্তর-দৃষ্টি সুমহান।
সমুদ্রের গহ্বরে নিহিত মুকুতা শত শত;
ত্যজ তীর, দাও ডুব; গুরুর সন্ধানে হও রত।

ফৈজীর সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি যদিও অদ্বিতীয় কবি ছিলেন—নিজের প্রয়োজনে ফৈজী কখনো কোন জিনিষ যাচ্ঞা করেন নি। তবু তিনি অন্য একজনের সম্রাটের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করে পত্র দিয়েছিলেন, অবশ্য সেই লোকটি ফৈজীকে ঘৃণা কর্ত্তেন (৫৪) তা' ফৈজী জানতেন।

---

(৫৩) এক দিনার প্রায় দশ পয়সা থেকে তিন আনা।

(৫৪) ধর্ম্মান্ধ বাদায়ুনী ছিলেন উদারপন্থী ফৈজী ও আবুল ফজলের শত্রু। একথা রাজদরবারের সকলেই জানত। বাদায়ুনী মিথ্যা কথা বলায় রাজ-রোষে কর্ম্মচ্যুত হলেন,

আমার মনে পড়ছে ফৈজী কি অপূর্ব্ব বিনীত ভাষায় সম্রাটের কাছে শক্রর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন ;—"সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত শুদ্ধ আত্মা পরিভ্রমণ করে বেড়ায়, যে সমস্ত সাধুপুরুষ প্রত্যহ প্রত্যূষে মাতা বসুন্ধরার স্তুতি গান করে—তাঁদের নামে আমি সম্রাটকে আমার নিবেদন জানাচ্ছি।"

তারপর আমি আবুল ফজলকে তাঁরই আবাসে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে গেলাম। এখানে আবুল ফজল গবেষণা-নিমগ্ন থাকতেন, তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। তিনি প্রচার করেছিলেন—"ভারতের বহু ঈশ্বরের উপরে স্থাপিত রয়েছেন পরমেশ্বর। সেই এক ঈশ্বরই সমস্ত মানবের স্রষ্টা ও পরিপালক। সুতরাং বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে ভারতবর্ষের মধ্যে মানুষের রক্তপাত করা হবে। বিরোধের অঙ্কুর নষ্ট ক'রে শান্তির পুষ্পোদ্যান রচনা করা হবে।"

ভগবন!

মন্দিরে মন্দিরে ফিরি তোমারে খুঁজিয়া,
তোমারি স্তব সকল ভাষায় উঠিছে ধ্বনিয়া।
মূর্ত্তিপূজক আর মুসলিম তোমারই বারতা বহে,—
তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়, সধর্ম্ম কহে।
নীরবে তোমারে করে স্মরণ মসজিদে মুসলমান,
গির্জ্জাতে তোমারি প্রেমে ঘণ্টাধ্বনি করিছে খৃষ্টান।

এই ত' ছিল আবুল ফজলের বাণী—তাঁর বাসনা ছিল তিনি মঙ্গোলিয়ার

ফৈজি তাঁর জন্ত সম্রাটের নিকট অনুরোধ করে তাঁকে কার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই ঘটনার কথাই জাহানারা উল্লেখ করেছেন এখানে।

সাধু মহাজনদের দর্শন করবেন—লেবাননের (৫৫) সন্ন্যাসীদের দর্শন করবেন। তার পরিবর্ত্তে তিনি তার প্রভুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পদে বরণ করলেন। ঈর্ষান্বিত রাজকুমার সেলিম বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। শোকে অভিভূত হয়ে সম্রাট আকবর আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। বন্ধু আবুল ফজলের জীবনের বিনিময়ে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

আমার পদতলে শিলাখণ্ড আমাদের বংশের বহু পাপের মূর্ত্ত প্রতীক হয়ে উঠল। আমাকে কি সমস্ত জীবন এই পথেই চল্‌তে হবে? অকস্মাৎ আমার পদনিম্নে একখণ্ড প্রস্তরে বৃহৎ রক্তচিহ্ন দেখলাম। আমি শিউরে উঠলাম—সম্রাট আকবরকে কি পাপ স্পর্শ করেছিল?

রাজ-তোরণের মধ্য দিয়ে আমি জুম্মা মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি পদতলের প্রস্তর খণ্ডগুলিকে রক্তাভ করে তুলেছিল। সেই পদভূমিকাতে সেলিম চিশ্‌তীর মর্ম্মর সমাধি মুক্তাশুভ্র ঔজ্জ্বল্যোদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল। এখন দেখছি সেখানে স্তম্ভনিম্নে আর কোন ইলাহী-শিষ্য উপস্থিত নেই। পুণ্যদিবসোচিত পরিচ্ছদভূষিত কোন মানুষ আর হোমকুণ্ডে উপস্থিত নেই। আমিই একা সেই মহাপুরুষের পুণ্যসমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রী।

এই ক্ষুদ্র পবিত্র তীর্থকেন্দ্রটি সম্রাট আকবরের সমাধির অনুরূপ—শ্রেণীবদ্ধ স-ছিদ্র শ্বেত মর্ম্মর গবাক্ষ সমাধি প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে। সেগুলি ইউরোপীয় মঠে ঝালর উৎসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। (৫৬)

(৫৫) লেবানন দেশে বালবেকের মন্দিরে এখনো ভারতীয় সন্ন্যাসীর অনুকরণে ভগবানের অর্চনা করা হয়। ধূপ, প্রদীপ ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা প্রতি সন্ধ্যায় দেবতার আরাধনা করে।

(৫৬) ক্যাথলিক মঠে এখনো ভক্ত খৃষ্টানগণ ঝালর উৎসর্গ করা পুণ্য কর্ম্ম বলে

সমগ্র হিন্দুস্থানে এমন আর কোন সমাধি মন্দির পরিকল্পিত হয়েছে এই অর্ঘ্য সম্রাট স্বয়ং সেলিম চিশ্‌তীকে উৎসর্গ করেছিলেন। আমি সোপান অতিক্রম করে প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হলাম। সম্রাট আকবরের দরজার উপর একটি রৌপ্য নির্ম্মিত অশ্বক্ষুর স্থাপন করেছিলেন। এই মাত্র যে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনছিলাম, তাই স্মরণ করলাম—আমি কল্পনার নেত্রে দেখলাম, সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে চলেছে আমার পিতাকে উদ্ধার করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ রয়েছে,—"ভগবান্, পৌত্তলিক শত্রুদের শাস্তিবিধান কর।" কিন্তু ঐ বিধর্ম্মীদের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তারা আমাদের সাম্রাজ্যের প্রহরী……!

অনন্তের সঙ্গে কালের যে সম্বন্ধ, অসীমের সঙ্গে স্থানের সেই একই সম্বন্ধ। এবার সমস্ত পার্থিব বিরোধিতার বিরুদ্ধে আমি আমার শৈশবের অন্তরালে আশ্রয় পেলাম। সেখানে একটি দেবদূত আমার কাছে গোপনবার্ত্তা নিয়ে আসছিল—একমাত্র আমার কাছে। ভগবান পক্ষপুটে যেমন বিশ্ববীজকে রক্ষা করেন (৫৭) তেমনি আল্লাহের সিংহাসন থেকে নেমে এসেছে একটি দেবদূত—সেলিম চিশ্‌তীর গম্বুজকে রক্ষা করবার জন্য।

শুদ্ধতমের সান্নিধ্য লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। সমাধি কক্ষের স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে চলে গেছে চতুষ্কোণ স্তম্ভশ্রেণী। প্রাচীরের স-ছিদ্র জানালার মধ্য দিয়ে দিনের আলো কক্ষের মধ্যে প্রবেশ

বিবেচনা করে। আকবরের সমাধিতে প্রস্তর নির্ম্মিত ঝালরগুলি খৃষ্টান মঠের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৫৭) প্রলয়ের দিনের সৃষ্টির জীব ভগবান পক্ষীরূপে স্বীয় পক্ষপুটতলে রক্ষা করেছিলেন। সেমিটিক ধর্ম্মমত এই সৃষ্টিরকাতত্ত্ব বিশ্বাস করেন।

করে। অভ্যন্তরের শ্বেত মর্ম্মর প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত পুষ্পাধারে রক্ষিত জলপদ্ম ও অহিফেন পুষ্প স্বর্ণাভ ক্ষীণ আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত। আমার মনে হ'ল যেন আমি চন্দন বনের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছি। আমার অন্তর্দৃষ্টিতে অতীত জীবনের বহু স্মৃতি ভেসে আসছিল,—আমি স্বর্গের শান্তি সদনে চলেছি, সেখানে আলোক বয়ে যায় শৃঙ্খলের মত চিরপ্রবহমান।

অতি সন্তর্পণে আমি গুপ্ত প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলে ফেললাম, এ যেন সূর্য্যাস্তে দিনের আলোর রূপ-পরিবর্ত্তন। এখানে গবাক্ষদ্বারই আলোক প্রবেশের একমাত্র পথ। গবাক্ষের উভয় পার্শ্বেই নির্ব্বাণহীন প্রদীপ মালা জ্বলছে।

অনন্তের সুবিশাল ক্ষেত্রেই আমি পুষ্প-সম্পদ চয়ন কচ্ছি; সমস্ত প্রাচীর গাত্রে ও গবাক্ষের অন্তরদেশের চিত্রিত পুষ্পগুলি দেখে আমার এই কথাগুলি মনে আসছিল; এই কুসুমদাম স্বর্গের নন্দন কানন থেকে চয়নিত। সেই কাননে অপ্সরাকুল পুষ্পের সুবাসেই জীবন ধারণ করে থাকে।

এই কক্ষের সর্ব্বোত্তম দর্শনীয় জিনিষ স্তম্ভের উপরে স্থাপিত চন্দ্রাতপ। শুক্তিমুক্তা ও আবলুশ কাঠের প্রচ্ছদপটে অপূর্ব্ব সুন্দর এই ভাস্কর্য্য। সমাধির গাত্রে শুক্তিমুক্তাগুলি যেন মনুষ্যচক্ষুনিঃসৃত অশ্রুকণা। আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল—কিন্তু আমি নতজানু হয়ে মস্তক অবনত করলাম।

সমগ্র জগৎ কি কতকগুলি সম্ভাব্যের সমাধি ক্ষেত্র নয়? বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠে আবার ধূলিতে পরিণত হয়। একটা মত্ত হস্তী বহু জীবন্ত প্রাণীকে পদতলে দলিত কচ্ছে। এই ত পরস্পরের প্রতি মানবের নৃশংসতার প্রতিচ্ছবি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের মতন মানবের দুঃখরাশি সঞ্চিত হয়—আকাশের গায়ে রক্তমেঘের মত—মেঘাবৃত সূর্য্যের মত! কিন্তু

অকস্মাৎ একটি স্বর্ণাভ উজ্জ্বল আলোর রেখা সমস্ত স্থানটি উজ্জ্বল করে দেয়—দুঃখের তরঙ্গ ততদূর স্পর্শ করতে পারে না……

মহম্মদের মতন (৫৮) স্বর্গে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর ; শৈশবে যেমন দেখেছিলাম, আজও দেখছি সেই মহম্মদের শুভ্র পশম বস্ত্র ধূলায় অবলুণ্ঠিত। (৫৯) বহু কম্পিত হস্ত সেই বস্ত্রের দিকে প্রসারিত—সহস্র মানুষ তাকে স্পর্শ কর্ত্তে চেষ্টা করেছে—জ্ঞান শিখরে মহম্মদকে অনুসরণ কর্ত্তে প্রয়াস করে………

আমি আমার মস্তক উত্তোলন করলাম—দেখলাম, শুক্তিমুক্তা সন্ধ্যার অন্ধকারে আর্দ্র ভারাক্রান্ত মানব চক্ষুর মতন উজ্জ্বল। যে সমস্ত মহাপুরুষ এই হতভাগ্য মানবদের দুঃখ সাগর থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রকাশ করেছিলেন, শুক্তিমুক্তাগুলি যেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। নীরবে আমার অধর প্রার্থনা জানাচ্ছিল—

"হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে যে আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেছে, তুমি সেই আনন্দ কণাগুলিকে স্বর্গে সংগ্রহ কর। আবার সেই আনন্দকে পরিশোধিত করে নূতন জগতে মানুষকে ফিরিয়ে দাও।"

আমি কি আমার কক্ষের পাশে পদধ্বনি শুনলাম? না, আবার নীরবতা। কিন্তু এখানে আবার কোন মানুষের স্পষ্ট পদধ্বনি! আমি উঠে দেখলাম সেই মুহূর্ত্তে দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। উন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে দিয়ে একটা আলোর শিখা—সেই আলোতে দেখলাম, দণ্ডায়মান এক

---

(৫৮) অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে মহম্মদ জেরুশালেমের মসজিদ থেকে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বরং মহম্মদ স্বর্গ ও নরক চর্ম্মচক্ষে দেখেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বিরাট সৃষ্টির রূপ দেখেছিলেন। এই ঘটনা "মেরাজ" নামে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত।

(৫৯) মহম্মদের ব্যবহৃত পশম-বস্ত্র মুসলমানগণ অতি পবিত্র বলে বিবেচনা করে এবং সেই বস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করে। এই উৎসবের প্রবর্ত্তক মহম্মদ।

উন্নতশির দীর্ঘদেহ শুভ্র উষ্ণীষধারী বীর সৈনিক পুরুষ—আমার রাখীবন্ধ ভাই।—আমি অকস্মাৎ পূর্ণবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম—তারপর বিস্ময় পরিণত হ'ল পূর্ণ প্রশান্তিতে। এইরূপ ঘটনা সম্ভব! দিব্যধাম থেকে আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল যেন আমি পূর্ব্বে আরও বহু জন্ম এই পৃথিবীতে বাস করেছিলাম। আমার যা' কিছু প্রাক্তন সৎকর্ম্ম, তা' এই মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমি এখন আর জাহানারা নই, আমি অনন্ত রাজ্যের একটি সত্তামাত্র।

তারপর আমার মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ফেল্লাম—তাঁর চক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ধারণা করলাম, আমি যে পত্র পেয়েছিলাম তা' তিনি লেখেন নি, আমার পত্রও তিনি পান নি, আওরঙ্গজেব একখানি পত্র জাল করেছিলেন। তাঁর লিখিত পত্রখানি নষ্ট করেছিলেন,—প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি আমার দিকে দেখলেন; তার নয়নের ভাষায় ছিল—"হে দোষলেশ-হীনা নারী"! তার পরমুহূর্ত্তেই তাঁর আকৃতিতে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। তাঁর সম্পূর্ণ দেহ কম্পিত হচ্ছিল, তাঁর রক্ত দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছিল, তাঁর চক্ষুর বর্ণ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমরা দৈনন্দিন জগতের উর্দ্ধলোকে উন্নীত হলাম। তারপর আমার অবসন্নতা এল, যেন বলে দিল আমাদের আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থান করা প্রয়োজন। আমি আমার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করলাম। আমি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, "আমার রাখীবন্ধ ভাই। নিস্তব্ধতা অপসৃত হ'ল।"

তিনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন, যেমন দরবার প্রবেশের প্রথম দিন করেছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি তাঁর ললাট নিবদ্ধ করপুট উত্তোলন করলেন—কম্পিত করপুট; তারপর হস্তদ্বয় বক্ষদেশ স্পর্শ করল, তখন তাঁর দৃষ্টি শুক্তিমুক্তাখচিত চন্দ্রাতপে নিবদ্ধ।

কখনো কোন নারী এই পবিত্রতম ধামে প্রবেশের অধিকার লাভ

করবে ? কিন্তু জাহানারা বেগম সেই অধিকার পেয়েছিল। এখন মনে হ'ল কক্ষটি যেন দিব্যত্ব লাভ করেছে।

সেই স্তম্ভবেষ্টিত কক্ষের মধ্যস্থলে শেখদের জন্য একখানি সতরঞ্চ বিস্তৃত ছিল। সেখানে বসে তারা অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের মঙ্গলার্থ নিরন্তর কোরাণ আবৃত্তি করতেন। আজ আমার মাত্র দুজন তীর্থযাত্রী। আমি 'রাও'কে সতরঞ্চের উপর উপবেশন করতে অনুরোধ করলাম—আমি একটু দূরে উপবেশন করলাম। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তাঁর গভীর বক্তব্য বিষয় প্রকাশের জন্য সমাধির নির্জ্জনতার প্রয়োজন।

'রাও' আমাকে স্পষ্ট করে বল্লেন—"আমাদের এই সাক্ষাতের উপর হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ; সেই জন্য আমি অশ্বারোহণে ছুটে এসেছি।" এইবার আমি বুঝতে পারলাম—অশ্বক্ষুর-ধ্বনির উৎস। আজকেই আমার পিতা স্থির করেছেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন। কিন্তু শায়েস্তা খান এবং খলিলুল্লা খানের প্ররোচনায় রাজকুমার দারা সে প্রস্তাবে সমস্ত হন নি। এই দুই বিশ্বাসঘাতক দারাকে বুঝিয়েছিল যে, 'সম্রাট যদি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন, তবে জয়ের গৌরব সম্রাটেরই প্রাপ্য—সম্রাট পুত্রের হবে না। ভাগ্যদেবতা রাজকুমারকে সৈন্যাধ্যক্ষের কৃতিত্ব প্রদর্শনের যে সুযোগ দিয়েছেন তা' ব্যর্থ হয়ে যাবে।' কি দুর্ভাগ্য, সহস্র দুর্ভাগ্য! দারা, তুমি অতি সহজে প্রতারিত হয়েছ—

'রাও' বল্লেন, "আমি দারার চক্ষু উন্মেলন করে দিতে পারি। সে কাজ আমাকে কালই কর্ত্তে হবে!"

মাথার উপরে মুক্ত আকাশ দেখবার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল। মুক্ত বাতাসে বসবার জন্য আকুল আগ্রহ হ'ল। এক্ষণে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার কাছে অতিশয় মূল্যবান। ফতেপুরের পরিত্যক্ত উদ্যানে ক্ষুদ্র প্রাসাদের সন্ধান করে নেব, সেখানে আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা চলবে।

আমি প্রথম শকটারোহণে অগ্রসর হলাম, একটি প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলাম। পূর্ব্বে যেখানে উদ্যান ছিল—আজ সেখানে প্রান্তর। কিন্তু পথপার্শ্বে পদ্মবনে স্তূপ—শীর্ষোপরি প্রাসাদ পর্য্যন্ত চলে গেছে। স্তূপের পদচুম্বন করে দুইটি আম্র বৃক্ষ পরস্পর মিশে রয়েছে। এই বৃক্ষযুগল রোপিত হয়েছিল একটা ধর্ম্ম উৎসবের অঙ্গরূপে। ভারতবর্ষের উদ্যানে—কৃষির সাফল্য কামনা করে দুইটি সজীব বৃক্ষশিশুর কূপের পার্শ্বে বিবাহ দেওয়া হয়, এই যুগল বৃক্ষ ছায়ায় আমি আমার রাখাবন্ধ ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করব।

তিনি এসে উপস্থিত হলেন। প্রবেশ পথের দ্বার উন্মোচনের সঙ্গেই আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন, আমার মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির উজ্জ্বলতায় আমার চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডল আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি সস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলাম—আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, প্রাচীন হিন্দু কাব্যের একটি নায়কের কাহিনী—ঐ আসছে মদনদেবের অগ্রদূত ; চন্দ্রালোকে আধারে নূতন রাজ্যসৃষ্টি করবে—হৃদয় ও আত্মার মিলনে সৃষ্টি হবে অন্তহীন একটি প্রেমের দিবস। (৬০) বসন্ত সমাগমে বৃক্ষে যেমন নবপল্লব সঞ্চারিত হয়ে উঠে, তেমনি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'ল প্রেম। আমি আমার রাখিবন্ধ ভাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম—"আল্লাহো আকবর"। জালা জালালুল্লাহ্" (৬১) তিনিও প্রত্যুত্তর দিলেন।

সেই প্রাসাদের তখনও মর্ম্মর আসনগুলি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিল,

---

(৬০) জাহানারা এইখানে বাণ রচিত হর্ষচরিত নাটকের উপমা উদ্ধৃত করেছেন।

(৬১) মুসলমানগণ সাধারণতঃ প্রথম দর্শনে সম্ভাষণ করে "আলেকুম-উস্ সেলাম" প্রত্যুত্তর দেয় "সেলাম আলেকুম্"। আকবর এই প্রথা পরিবর্ত্তন করে দিলেন, সম্ভাষণের রীতি নূতন করলেন "আল্লাহো আকবর"। "জালা জালালুল্লাহ"। এই রীতির জন্য আকবরকে অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছিল।

"রাও" কতগুলি পত্র আসনে রেখে দিলেন। আমরা আমাদের নূতন দেওয়ান-ই-খাসে উপবেশন করলাম। প্রথমেই পত্রগুলির যথার্থ সংবাদ জানতে আমার বাসনা জ্ঞাপন করলাম। আমি সত্য ধারণাই করেছিলাম —সত্যই তিনি আমার কোন পত্র পান নি। আমায় কোন পত্রও লেখেন নি। আমরা যেন ঘটনার শৃঙ্খল পর্য্যবেক্ষণ করলাম। এই ব্যাপারে উভয়েই লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

তারপর রাখীবন্ধ ভাই আমার নিকট আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে তার পলায়ন কাহিনী বিবৃত করে গেলেন। রাজদরবারে উপস্থিত হবার আদেশ-পত্র যখন "রাও"এর কাছে উপস্থিত হ'ল, আওরঙ্গজেব তাঁর দাক্ষিণাত্য ত্যাগ বন্ধ করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু হরবংশের কুমার তার বিশ্বস্ত রাজপুত অনুচর নিয়ে উদ্বেলিত নর্ম্মদা অতিক্রম করে এসেছেন। আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু আক্রমণ কর্ত্তে সাহস করে নি।

তারপর সংবাদ এলো আওরঙ্গজেব আমার ভ্রাতা মুরাদকে তাঁর পক্ষে টেনে এনেছেন ষড়যন্ত্র করে। "রাও" বিদ্রোহের প্রারম্ভে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মুরাদকে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি পাঠ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কনিষ্ঠ সহোদর মুরাদ তার সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে উৎসাহিত করবার জন্য গর্ব্বের সহিত এই পত্রখানি প্রত্যেক সেনানায়কদের দেখিয়ে-ছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনবান বণিকদিগকেও দেখিয়েছিলেন। এই পত্রের প্রতিলিপি আজও আমার নিকটে রয়েছে :—

"বীর শাহজাদা মুরাদ বক্স, তোমাকে জানাচ্ছি—আমি সংবাদ পেয়েছি যে, শাহজাদা দারা বিষ প্রয়োগে পিতাকে হত্যা করেছেন এবং সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণ করেছেন—উদ্দেশ্য, সম্রাট পদবী গ্রহণ করবেন। এই কারণে শাহজাদা শাহসুজা একটি প্রবল বলশালী সৈন্যদল নিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য এবং দারার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য অগ্রসর হয়ে-

ছিলেন। আমি এই সংবাদ শুনে তোমায় পত্র লিখে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি ভিন্ন কোন রাজকুমার সম্রাট হওয়ার উপযুক্ত নয়। দারা বিধর্ম্মী, দারা পৌত্তলিক, দারা ইসলাম ধর্ম্ম বিনাশক ; শাহজাদা শাহশুজা ধর্ম্মচ্যুত, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সে আমাদের ধর্ম্ম-বিরোধী। আমার কোরাণের প্রতি আসক্তি তোমাকে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাটপদে অভিষিক্ত করবার জন্য উৎসাহিত করছে। কারণ, একথা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে আমি বহুদিন পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করেছি এবং মক্কায় গিয়ে আমার শেষ জীবন অতিবাহিত করব, এই আমার ব্রত। আমি তোমার নিকট আবেদন জানাচ্ছি—তুমি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করো যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি তোমাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটপদে অভিষিক্ত করবার পরে তুমি আমার পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। যদি তুমি আমাকে কোরাণ স্পর্শ করে এইরূপ কাজের প্রতিশ্রুতি দাও, তবে আমিও শপথ করছি যে, আমার সমস্ত শক্তি, কৌশল ও বুদ্ধি তোমার অনুকূলে ব্যবহৃত হবে এবং তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। আমার এই শপথের প্রতিভূস্বরূপ আমি তোমার নিকট এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণ করছি। এই অর্থ দ্বারা আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় এবং চিরন্তন ঐক্য ও বান্ধবতা স্থাপিত হবে—আমরা সহোদর ভ্রাতা, এক পিতার সন্তান, এক ধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং উভয়েই কোরাণের রক্ষক। এই খানেই পত্র শেষ হোক্। তোমার আগমন প্রত্যাশা করি। ইতি—

তোমার বিশ্বাসী ভ্রাতা

আওরঙ্গজেব

আমি লজ্জায় আমার মস্তক অবনত করলাম এবং হৃদয়বিদারক শোকে আর্ত্তনাদ করে উঠলাম।—ওঃ, কি শঠতা! আমাদের

বংশের কি ভীষণ অবমাননা। কিন্তু এই কপট শাসকের নিকট ভারতের প্রাচীন বীর বংশ তাদের রাজ্যভার অর্পণ করতে বাধ্য হবে! আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে একটি হিংস্র ব্যাঘ্র লুকিয়ে আছে—যেমন ছিল তৈমুরের হৃদয়ে; কিন্তু তৈমুরের নামের মহিমা কখনও আওরঙ্গজেবের মুকুটকে স্পর্শ করবে না।

"রাও" আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেন। সমস্ত প্রাসাদব্যাপী নির্জ্জনতা। তিনি আবার যখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর সুর পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি আসন পরিত্যাগ করেউঠলেন এবং ইতস্ততঃ পদ সঞ্চালন করছিলেন। গম্ভীর স্বরে বল্লেন,"আমাদের সামন্তগণ আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। যখন রাজ পরিবারের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হ'ত, রাজস্থানের নায়কগণ তাঁকেই সাহায্য করতেন—যিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বা হর্ষবর্দ্ধনের যুগ থেকেই আমাদের যোদ্ধৃজাতি এক আশা পোষণ করেছে, এক স্বপ্ন দেখেছে—ভারতবর্ষ হবে একচ্ছত্র সামাজ্য। কোন বিদেশী সম্রাট আকবরের সমতুল্য হয়নি। সুলতান বাবর ও হুমায়ুনের মত সম্রাট আকবর সমরখন্দ কিংবা বোখারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি অভিলাষ করেছিলেন, ভারত ভূমিতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন—যার ভিতরে সর্ব্ব দেশের সর্ব্বোত্তম পদার্থের সমাবেশ থাকবে। তিনি ভারতবাসীকে বিশ্বাস করতেন, ভারতবাসীর উপর নির্ভর করতেন এবং তিনি ভারতবর্ষেরই একজন হয়েছিলেন। সেই স্বর্গবাসী সম্রাট আকবরের সমতুল্য হয়ত কেহ হয় নাই। কিন্তু আওরঙ্গজেব রাজ্যভার পেলে যা হবে তার মতও কেহ হয় নাই। আওরঙ্গজেব ভারতবাসীকে ঘৃণা করে……।"

আমি সাহস করে "রাও" এর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তাঁর সহজ, সরল, শান্ত নয়ন অকস্মাৎ পিঞ্জর-মুক্ত ঈগল চক্ষুর মত তীব্রোজ্জ্বল হয়ে

উঠ্‌ল। তাঁর সঞ্চরমান চক্ষুর মণি বিদ্যুৎশিখার মত দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করছিল। তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অপূর্ব্ব রাজোচিত মূর্ত্তি—মেরু শিখরে অগ্নিগর্ভ বিষ্ণুর প্রতীক।

তিনি আবার মৃদুকণ্ঠে বল্লেন—"আওরঙ্গজেব হিন্দুকে ঘৃণা করেন—তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি আমাদের আছে, একথা আওরঙ্গজেব জানেন। তিনি আমাদের নির্ভীকতাকে সন্দেহ করেন না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ঘৃণা করেন। আওরঙ্গজেব স্বর্গকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। কোরাণের দুই মলাটের অভ্যন্তরে যারা এই পৃথিবীকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের সঙ্গে আওরঙ্গজেব স্বর্গের একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান কোরাণকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁদের শাসনতলে হিন্দু প্রজাগণ নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব আপনাকে ঈশ্বরের মত নির্ভুল মনে করেন। সুতরাং বংশধরদের দ্বারা তাঁর রাজ্যের সতরঞ্চ-খেলা খুলে বসেছেন। রাজ্যের সিংহাসন খেলায় জয়লাভ করবার জন্য কোন কাজই তিনি অন্যায় মনে করেন না। যদি তিনি জয়লাভ করেন তবে সম্রাট আকবরের মহানুভব রাজ্যে যা কিছু ভাল ছিল, সবই নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুস্থান আবার সেই অন্ধকারে ডুবে যাবে। সম্ভবতঃ শত শত বৎসর ব্যাপী……।"

আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, "সে কখনও জয়ী হতে পারে না।" সেলিম চিশতির সমাধি মন্দিরে শোকের যে তীব্রতা হ্রাস হয়েছিল, তা' আবার "রাও এর উপস্থিতিতে নূতন করে আমাকে আহত করল। আমরা ক্ষয়িষ্ণু ভিত্তির উপর ইতস্ততঃ বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হ'ল—পদনিম্নে এক তলহীন সমুদ্রগহ্বর মুখব্যাদান করে অপেক্ষা করছে।

তারপর আমি "রাও"কে অতীতের ঘটনা বর্ণনা করে বল্লাম, শাহজাদা দারা তাঁর যৌবনে আমাদের পিতা আওরঙ্গজেব, শুজা এবং মুরাদকে

আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী একটি নদী সংযোজিত ছিল, এলেপ্পো দেশে নির্ম্মিত বহু মুকুট ছিল সেখানে। শাহজাদা দারা এই কক্ষটি দেখবার উদ্দেশ্যেই এই নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছিলেন। (৬২) দারা অনেকবার কক্ষে যাতায়াত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব একটিমাত্র দরজার পার্শ্বে বসেছিলেন এবং একবারও কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি। অবশেষে তিনি উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সম্রাট্ তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে আওরঙ্গজেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল শাহজাদা দারা হয়ত সম্রাটকে ও সম্রাট পুত্রদ্বয়কে আবদ্ধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি চিৎকার করে বল্লাম, 'আওরঙ্গজেবই আমাদের সকলকে আবদ্ধ করে রাখবে, একমাত্র রোশন-আরাই মুক্ত থাকবে।'

"রাও" পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন এবং বল্লেন, "সম্রাটের একজন গুপ্তচর সন্ধান পেয়েছিল যে, রোশন-আরা সর্ব্বদাই আওরঙ্গবের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। এই সমস্ত পত্রের উপর নির্ভর করেই আওরঙ্গজেব এত শীঘ্র ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। অন্তঃপুরের আবরণ অন্তঃপুরিকাকে পুরুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নারীর অস্ত্র পুরুষের অস্ত্র অপেক্ষা ভীষণতর।"

চতুর্দ্দিকে শঠতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি বলে উঠলাম, "আমি যদি সমর্থ হতাম তবে চাঁদবিবির মত যুদ্ধে যোগ দিতাম। তিনি সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। আমারই বংশের কুলবধূ নূরজাহান বেগম তাঁর কারারুদ্ধ স্বামী জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করার জন্য হস্তী পৃষ্ঠে নদী অতিক্রম করেছিলেন……। (৬৩)

---

(৬২) এইরূপ একটি কক্ষ আকবরের সময়ে হাকিম আলি গিলানী নির্ম্মাণ করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে সেই বর্ণনা আছে।

(৬৩) মহবৎখান জাহাঙ্গীরকে আবদ্ধ করেছিলেন। নূরজাহান স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে

তারপর "রাও" গাত্রোত্থান করলেন। দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তিনি সম্মুখের আসনে আঘাত করলেন। আমি ভাবলাম, বুঝি মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। তিনি বল্লেন, "শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঘোষণা করেছিলেন, যদি তৈমুর বংশের সমস্ত সন্তানও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করে, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আমিও বলছি যে, সম্রাটের ভারতীয় অনুচরগণ যদি দলবদ্ধভাবে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সিংহাসনের পথে অগ্রসর হয় তবে সম্রাট কখনও বশ্যতা স্বীকার করবেন না। রক্তবর্ণের আস্তরণ অতিক্রম করে আসতে হবে।"

আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার সম্মুখে দেখেছি ইসলামের প্রথম অভিযানের পর থেকেই আমার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ইসলামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে এসেছেন। সেই বীর পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মাণিক রায়। মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী আজও বুন্দী রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়। তারপর গোগা চৌহান মামুদ গজনীর বিরুদ্ধে মৃত্যু অভিযান করেছিলেন—তাঁর ছয়চল্লিশটি পুত্রসহ।

আমি চৌহান চারণ কবি চাঁদ বরদাইয়ের ভাব অনুকরণ করে বল্লাম—"শত্রুর উন্মুক্ত তরবারির বিরুদ্ধে তীর্থ যাত্রীর মতনই তাঁরা অভিযান করেছিলেন। আমি মামুদ গজনীকে ঘৃণা করি।"

"রাও" বোধ হয় আমার কথায় শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল আমার কথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বলে চল্লেন, "এই বীর সন্তানদের মৃত্যু নিষ্ফল হয়নি। আমরা ভারতীয় যোদ্ধারা কি কখনও দেশান্তরে অভিযান করে কোন মস্‌জিদ নষ্ট করেছি? কিন্তু

আরোহণ করে শত্রু মিত্রের বিরুদ্ধে অসি চালনা করে স্বামীকে মুক্ত করেন। সে এক অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী।

পবিত্র আল্লাহর নামে রাজস্থানের পথে যুগ যুগ ধরে রক্তের নদী বয়ে গেছে। মন্দিরের পর মন্দির এই ভারত ভূমিতেই লুণ্ঠিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। নাগর-কোটের পবিত্র মন্দিরের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা মামুদ নির্ব্বাপিত করেছিলেন। বিরাট সোমনাথ মন্দিরের ধনরত্নরাজি তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন। বহু শতাব্দী সঞ্চিত হিন্দুরাজন্যবর্গের ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছিলেন তিনি। ভারতের দেবতার মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি মন্দির থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে নদী-সমুদ্রগর্ভে আজও সমস্ত জাতির পাণ্ডুর শবদেহের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।"

"রাও" আবার শূন্য পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—যেন তিনি বহু দূরে কোন কিছুর সন্ধান করছিলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁর রাজোচিত আভিজাত্য ফুটে উঠল—তিনি বল্লেন, "আজমীরের চৌহান রাজ বংশের সন্তান সুলতান মামুদকে তাঁর রাজধানী অবরোধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। সেই হ'ল সুলতান মামুদের শেষ ভারত অভিযান। কিন্তু চৌহানরাজা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। শতাব্দী অতিক্রান্ত হ'ল—আবার সেই দুর্দ্দশার পুনরাবৃত্তি—ভারতের চিরন্তন অবমাননা। সেইদিন কনৌজের রাজা আজমীর—দিল্লীর অধিপতি ভারতবাসীর শেষ রাজা পৃথ্বীরাজকে ধ্বংসের জন্য মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করছিলেন। কিন্তু কনৌজ রাজও সেই বিপদ থেকে অব্যাহতি পান নি। এই দুটি রাজ্যের পতনের পর ভারত-বর্ষের মুখে যে পরাধীনতার চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল, তা' আজও নির্ম্মূল হয়ে যায় নি।"

আমি মৃদুস্বরে বল্লাম—'সংযুক্তা'—সে স্বর একমাত্র আমিই শুনলাম। অবগুণ্ঠনের নিম্নে আমার কপাল রক্তিম হয়ে উঠল। কিন্তু সে শব্দ তিনিও শুনলেন। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন—তাঁর মুখমণ্ডল রক্তহীন হ'ল, কিন্তু পাংশু না হয়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল। আমি পূর্ব্বে সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য

করেছিলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে যেন একটা ছায়া সম্পাত হ'ল, কিন্তু তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ফুটে উঠলো ঔজ্জ্বল্য। তিনি বল্লেন, পৃথ্বীরাজের নিকট সংযুক্তার স্থান পার্থিব সম্পদের বহু উর্দ্ধে। সুতরাং সংযুক্তার আকর্ষণে পৃথ্বীরাজ তাঁর সিংহাসন এবং জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। কতবার রাজপুত প্রেমের জন্য, সম্মানের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। রাজ-কুমারী, তোমার মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে আমার মণিবন্ধের বন্ধন করে দাও। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তাই নিয়ে অবতীর্ণ হব। ঐ দেখ, দূরে ঐ প্রান্তরে আজও সম্রাট আকবরের আকাশপ্রদীপ জ্বলছে। সে আকাশ প্রদীপ সম্রাট তাঁর সৈন্যদের রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধান্তে ফতেপুর শিকরী প্রত্যাবর্ত্তনের পথ আলোকিত করবার জন্য নির্ম্মাণ করেছিলেন। বেগম সাহেবার রাখীবন্ধ ভাইরূপে আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদের মত ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এই কথা স্মরণ করব এবং সর্ব্বস্বপণ করব, বেগম সাহেবের সম্মান—আমারই সম্মান।"

"রাও" আমাকে পূর্ব্বের মতই সম্মান করতেন। এখন আমি স্বস্তির নিশ্বাস নিলাম। আমি আমার অবগুণ্ঠনের অংশ ছিন্ন করে তাঁর মণিবন্ধে বেঁধে দিলাম। সেই ছিন্ন অবগুণ্ঠন প্রথমে আমার অধর স্পর্শ করেছিল।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। মনে হ'ল আজকের অর্দ্ধদিবস আমার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করে যাবে। সুতরাং আমি আজ আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাথে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ উপভোগ করব।

অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তিমাভা দিকচক্রবাল রেখান্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা সূর্য্যোদয়ে পথ অতিক্রম করে চলেছি। চতুর্দ্দিকের বিলীয়মান শূন্যমণ্ডলের রেখান্তে আকাশ আবরণের অন্তরালে শুক্তি-মুক্তার মত প্রতিভাত হচ্ছিল। অদূরে মেঘখণ্ডগুলি অগ্নিশিখার মত স্বর্ণাভ নীললোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত। দূর প্রান্তর থেকে উত্থিত

ভাসমান কুজ্ঝটিকা অরুণরাগে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সত্যিই আমরা সেই রক্ত আলোর মধ্য দিয়ে নন্দন কাননের পথে পরিভ্রমণ করেছিলাম।

করবী ও প্রবাল বীথির মধ্য দিয়ে একটি পথ শুষ্ক সরোবরের দিকে চলে গেছে। এইখানে সম্রাট বাবর জলকেলী করতেন, কিংবা কখনও মধ্যস্থলে উচ্চাসনে বসে বিশ্রাম করতেন। পূর্ব্বে এই স্থানটি ছিল একটি সামান্য গ্রাম। এর নাম ছিল শিকৃরী। আমি সরোবরের পার্শ্বে গিয়ে সেই উচ্চাসনে বসলাম। "রাও" উচ্চাসনের প্রান্তে সোপানে উপবেশন করলেন।

যে সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ মনে মনে আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন কিংবা মীরজুমলা ও নজবৎখানের মত যারা পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কথা বল্লাম। "রাও" মস্তক সঞ্চালন করে কি যেন দূরের জিনিষ দেখতে পেলেন। আমি দেখলাম, তাঁর উষ্ণীষের অন্তরালে মুক্তাহার সংলগ্ন দু'টি অপূর্ব্ব মুক্তাখণ্ড। আমি আমার আনন্দের উচ্ছ্বাস সংবরণ করলাম। এতো আমারই প্রদত্ত উপহার।

এক নূতন সুরে তিনি বল্লেন—"বেগম সাহেবা, ঐ দেখুন সেই প্রান্তর—যেখানে একদা বাদশাহ বাবর ও রাণা সংগ্রামসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন······।

আমি আর সেই রক্ত-প্লাবনের কাহিনী শুনতে পারলাম না। আমারই সহধর্ম্মিগণ ভারতের ওপর গিয়ে কি রক্তবন্যাই না বইয়েছিল !

আমি বল্লাম, "যদি এই যুদ্ধই সাম্রাজ্যের জন্য শেষ যুদ্ধ হ'ত, আর আমার ভ্রাতা দারা যদি ফতেপুরে প্রবেশ করে শান্তির উৎসব সমাপন করতে পারতেন······।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে "রাও" বল্লেন, "এই নগরটি চিতোর লুণ্ঠনের শেষ যুগে নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। রক্তের মধ্যে দিয়েই এই সাম্রাজ্যের বন্ধন রচনা করেছিলেন এবং রক্ত দিয়েই সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করতে হবে।

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এক নূতন বিশ্বাস দিয়ে সেই ঐক্য রক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু তৈমুর বেগের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যের বিশালতার জন্যই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। সম্রাট আকবরের স্বপ্নও এত বিরাট ছিল যে, লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র মানব সেই স্বপ্ন সফল করতে পারেনি। তবু আমরা আজও সেই স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে বেঁচে আছি······।"

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে হ'ল—আমার জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন আছে,—যেখানে আমরা উভয়ে দণ্ডায়মান হতে পারি। আমি বল্লাম, "সম্রাট আকবর ভারতবাসীকে ভালবাসতেন এবং তিনি রাজস্থানের নারীদের বিবাহ করেছিলেন······।"

"রাও" একটু তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, "তিনি সব সময়ই হিন্দুদের সম্মান করেন নি। রাজস্থানে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট পৃথ্বীরাজের স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই পৃথ্বীরাজই প্রতাপকে লিখেছিলেন—'হিন্দুই হিন্দুর ভরসা'। সম্রাট আকবর নওরোজ উৎসবে পৃথ্বীরাজ-জায়াকে তাঁর স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং রাণী সেই অপমানে তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমার বংশের রক্ত আমার শিরার ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি বল্লাম, "যদি এমন কোন মানব থাকে যার জন্য আমি চিরন্তন শান্তি বিনিময় করতে পারি, তবে সেই মহামানব ভারতের সম্রাট আকবর।" রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। আবার বল্লাম, "তাঁর নয়নের একটু সম্মতি দৃষ্টির জন্য আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি।" রাওয়ের মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তাঁর দৃষ্টি অবনমিত হ'ল। আমার ভাষা তাঁকে তীব্রভাবে দংশন করেছিল। আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল,—আমি বল্লাম, "পৃথ্বীরাজ জায়ার মত আমি যদি কোন ভারতীয় রাজকুমারকে বিবাহ করতাম!"

সূর্য্যরশ্মি মেঘের কোলে বিলীন হয়ে গেল। অতি ক্ষীণ শুভ্র কুজ্ঝটিকা সূর্য্যকে আবৃত করে দিল। অস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সূর্য্য মুহূর্ত্তের জন্য

দিকৃচক্রবালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—যেন একখণ্ড বিরাট হীরক আলোক শিখার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে গেল। আমরা দুজনে শেষ সূর্য্য রশ্মির আলোকে মহিমান্বিত হয়ে গেলাম। "রাও" আমার দিকে চেয়ে রইলেন, সস্মিত দৃষ্টি। বোধ হয় আমার অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আমার হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল।

"রাও" বল্লেন—"শাহজাদী, আমায় মার্জ্জনা করুন—আমার ভিতরের সুপ্ত সৈনিক জেগে উঠেছিল। আমি আপনার অনুগত, আমি সম্রাট সাহজাহানের সামন্ত মাত্র।" আমার মণিবন্ধের নূতন বন্ধন "রাও" তাঁর অধরপুট দ্বারা স্পর্শ করলেন।

আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত আমি ফতেপুরে বিশ্রাম করব,—এই সিদ্ধান্ত রাওয়ের মনঃপূত হয়নি, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। তবু তিনি স্থির করেছিলেন, প্রভাতের পূর্ব্বে তিনিও সেইস্থান ত্যাগ করবেন না। তাঁর সৈন্যগণ আমার ক্ষুদ্র প্রাসাদের নিম্নতলে রাত্রি-যাপন করবে এবং তিনি স্বয়ং উপরের তলে গম্বুজের নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরেই আমাদের পরবর্ত্তী সাক্ষাৎ হয়েছে। খোজা ক্রীতদাস আমাদের সম্মানিত অতিথির জন্য নিম্নতলের সুন্দরতম কক্ষে অতি অনাড়ম্বর ভোজের আয়োজন করেছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমি স্থান, কাল এবং যুগ যুগান্তর অনুসৃত সমাজ-নিয়ম অতিক্রম করে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যেন আমি স্বহস্তে আমার রাখীবদ্ধ ভাইকে কিছু ফল পরিবেশন করি। আমার প্রকোষ্ঠের বহিরাংশে দ্বিকোণে প্রাচীরের পার্শ্বে আমার কোয়েল একটি মৃৎপাত্রে চম্পক পুষ্প এবং একখানি সবুজ কুশান রেখেছিল। কস্তুরীগন্ধ নিঃসৃত বৃহৎ প্রদীপাধারে দুটি মোমবাতি রক্ষিত ছিল। প্রদীপাধারের দুই পার্শ্বে দুটি প্রবাল-প্রদীপ জলছিল। একটি ক্ষুদ্র টেবিলে সবুজ তরমুজ এবং সোনালী আঙুর রক্ষিত

ছিল। সেগুলি বাবরের কাবুল উদ্যান থেকে আমদানী করা হয়েছিল। পেয়ারা, আম, পীত, শুষ্ক খেজুর, খুবানী এবং বাদাম বসরা ও ইরাণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সুবর্ণ পাত্রে মূল্যবান সুরা রক্ষিত ছিল —সিরাজের সেই সুরা ছিল সিরাজের রক্ত অশ্রু। প্রথম রাত্রির বাসর-গামিনী নববধূর মত সলজ্জ হস্তে আমি কয়েকটি পুষ্প চয়ন করে আমার কর্ণদ্বয় অলঙ্কৃত করলাম। আবার নিজেকে অলঙ্কার বিভূষিত করে তুল্লাম। এই ত একটু পূর্ব্বে আমি সেই অলঙ্কার দান করতে চেয়েছিলাম।

"রাও" আমার কক্ষ দ্বারে উপস্থিত। তাঁর মুখমণ্ডল আমার কাছে নিত্যই নূতন। তাঁর আকৃতিতে ভীষণ সংগ্রাম ও অদম্য ইচ্ছা শক্তির আভাস। কোন মুহূর্ত্তে তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠত, আবার অন্য মুহূর্ত্তে তাঁর দৃষ্টি এত গম্ভীর আকার ধারণ করত যে আমি ভীত হয়ে উঠতাম।

তিনি আমার সম্মুখে, আসনে উপবেশন করলেন—তাঁর দৃষ্টি অবনমিত। আমরা অলিন্দের কোণে পরস্পর বিপরীত দিকে চতুষ্কোণ আসনে উপবেশন করলাম। আমাদের মস্তকের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র-অর্দ্ধগোলাকৃতি প্রাচীর—বহুদিন যাবৎ সূর্য্যবংশের সন্তানগণ স্বর্ণ পীতাভ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত; অপরিবর্ত্তনীয় আলোর গভীর রেখা এই বংশের সন্তানদের মুখমণ্ডলে চিরতরে অঙ্কিত রয়েছে। সেই বীরপুরুষ আমার সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

আমরা পরস্পরের অতি নিকটে বসেছিলাম, তবু মনে হচ্ছিল যেন— এক অদৃশ্য অতলস্পর্শী গভীরতা আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচনা করেছিল। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে জীবন, আমাদের পশ্চাতে সহস্র বৎসর······।

আমাকে কে যেন অকস্মাৎ প্রশ্ন করতে বাধ্য করল—"সংগ্রামে যখন মানুষ হত্যা করে, তখন তাদের অনুভূতি কি রকম হয়?" আমি আমার

পান্নাখচিত পানপাত্র তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি পানপাত্র স্পর্শ না করে দূরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি উত্তর দিলেন—"আমরা রাজপুত যদি অস্ত্রধারণে অক্ষম হ'তাম, তবে রাজস্থানের অস্তিত্ব থাকত না, মুঘল সাম্রাজ্য আজ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না, হে শাহজাদী! হন্তা এবং নিহত উভয়ই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এক স্রোত বয়ে চলে--আমরা তাকেই বলি জীবন। নদী অসীম সমুদ্রের সন্ধান করে। মানুষের জীবন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অসীমের সন্ধানে ছুটে চলে। আমি যখন সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করেছি, মানুষ হত্যা করেছি—মনুষ্যত্বের দাবীই আমায় প্রেরণা দিয়েছে। যেদিন আমি যুদ্ধে নিহত হব, আমি মনে করব আমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করেছি।"

আমি আবার মনস্তাপে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার ভয় হ'ল—আমি বোধ হয় আমার বীর ভ্রাতাকে হারাব। আমি প্রায় স্বগত উক্তি করলাম—"আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে চিরন্তন পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করে?" আমি আমার অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম—এই অদৃষ্টই ত মানুষকে স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। "রাও"য়ের মুখমণ্ডল মধুর মৃদুতায় ভরে গেল, তিনি বল্লেন, "নাড়োলের এক প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ ছিল হররাজকুমার অলংদেবের কাহিনী—সিংহাসন আরোহণের দিনে অলংদেব বুঝেছিলেন যে এই জগৎ অনিত্য অর্থাৎ পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মত অদৃশ্য হবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তার রূপ ধারণ করে। শাহজাদী জাহানারা! এই যে স্বর্গীয় আনন্দের শিশিরকণা আমরা উপভোগ করছি, তারা কি প্রমাণ করে না যে জীবনস্রোত আনন্দ-সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে? মানুষ কি চিরন্তনের আকাঙ্ক্ষা করে না......?

তিনি আমার প্রদত্ত পানপাত্রটির উপর তার করপল্লব সঞ্চালন করে আদর করছিলেন। আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি। তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেই আমার

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে একজন সম্রাট ছিলেন, তিনি জীব হত্যা নিষেধ করলেন। তাঁর নাম ছিল অশোক—তিনি ইহজগতে যা কিছু করতেন—সমস্তই পরজগতের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত হ'ত। মুকুরের কাঁচ খণ্ডের মত ছিল তাঁহার অন্তরের প্রশান্তি।" "রাও" যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছিলেন—"অশোক ছিলেন অহিংসাবাদী, তিনি শত্রুর জন্য আর্য্যাবর্ত্তের দ্বার রেখে গেলেন উন্মুক্ত। উত্তর দিক থেকে শত্রুর অভিযান আরম্ভ হ'ল—সেই সংগে ছিল হিংস্র হত্যাকারী···।

আমি তাঁর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত মনঃসংযোগ দিয়ে শুনছিলাম। কিন্তু অনেক দিন পরে তাঁর সেই কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করেছিলাম। সেই পরম শুভক্ষণে একমাত্র তাঁর চিন্তাই আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিচ্ছিল। তিনি আমার সম্মুখে বসেছিলেন—তাঁর উষ্ণীষ শুভ্র, তাঁর রাজ-ভূষণ শুভ্র, তাঁর বর্ণ শুভ্র, তাঁর কটিদেশে ছিল শুভ্র কিংখাবের কোমর-বন্ধ, তাঁর চরণতলে সুবর্ণ রেখাঙ্কিত কমলদল কি সুন্দর, সুসঙ্গত!

আকাশে তারার মেলা বসেছে—একটি তারাও আমাদের মাথার উপর আলোক সম্পাত করতে কার্পণ্য করেনি। সে তারাটি আমাদের নিকটতম ও উজ্জ্বলতম ছিল—সেটি অন্তঃপুর উদ্যানের পার্শ্বে দুইটি বৃক্ষের অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল—তারার গতি যদি আমি স্তব্ধ করে দিতে পারতাম! কারণ, তারাটি আমাদের সময় পরিমাপ করছিল, রক্তধারা আমার বক্ষের মধ্যে দ্রুতগতি চলেছে, আমার কত কথা বলবার ছিল; আমি স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে বসে আছি। কিন্তু নন্দন দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ, একটি পদক্ষেপ করেও স্বর্গে প্রবেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না।

আবার আমরা আলোচনা আরম্ভ করলাম—সম্রাটের কথা, শাহজাদা দারার কথা। সেই নক্ষত্রটি দূরে বিটপীর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি উঠে পড়লাম; কারণ তাঁর আহারের সময় হয়ে এসেছে। সম্রাট আকবরের নিয়মানুকরণে তিনি আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি

ভূমিস্পর্শ করে আকবরের অনুকরণে সিজ্‌দা (৬৪) করলেন। সে সম্ভাষণ কি সহজ সুন্দর, কি অপরূপ আভিজাত্য-পূর্ণ; মনে হ'ল যেন তিনি এই প্রকার বিদায় সম্ভাষণে অভ্যস্ত। তারপর তিনি মস্তক উত্তোলন করে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন।

তিনি সম্ভাষণ করলেন, "শাহজাদি!" সে স্বর আজও আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে,—"শাহজাদি, আপনার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে বিস্মৃত হয়ে গেছেন। স্বপ্ন দিয়ে আপনার যে রূপ কল্পনা করেছিলাম—সেই রূপ আমি স্মরণ করতাম; অবশ্য আমি সে বাস্তব মূর্ত্তি কখনো দেখিনি। তবু আমার অন্তরে সেই কল্পনার মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা করতাম, আজ যখন আপনাকে অবলোকন করলাম।"...মুহূর্ত্ত নীরব থেকে আবার বল্লেন, "আজ যখন আপনার বাণী শ্রুতিগোচর হ'ল, অদৃষ্ট ভিন্ন আর কেহই ছত্রশালকে প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না।"

তিনি তাঁর বাহুদ্বয় বক্ষসংলগ্ন করে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। আমি গম্বুজের নীচে সবুজ কুশানের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেখানে শূন্য আসনের পার্শ্বে প্রদীপটি ঈষৎ বায়ু সঞ্চালিত হচ্ছিল। আমি পুষ্পাধার থেকে কয়েকটি চম্পক তুলে নিলাম, আমার অবগুণ্ঠন থেকে রূপালী সুতো নিয়ে মালা গাঁথলাম—দিল্লীর প্রাসাদে আর এক রজনীতেও এমনি আমি মালা গেঁথেছিলাম। কিন্তু আজ মনে হ'ল আকাশ আরো দূরে সরে গেছে, আজ আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর স্বর্ণাভা অস্পষ্ট নীল সমুদ্রে মিশে গেছে।

(৬৪) মুসলমানগণ আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাহাকেও প্রণতি জানায় না—কিন্তু আকবর বাদশাহ সম্রাটকে অভিবাদন 'সিজ্‌দা' করতে আদেশ করেছিলেন—নাম দিলেন "জমিন বুস"—ভূমি-চুম্বন। এই প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য আকবরকে অনেক কটূক্তি সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল। পরিশেষে সম্রাট পরিবারের লোকও এই সিজ্‌দা দাবী করতেন। ছত্রশাল জাহানারাকে সিজ্‌দা করলেন।

কিন্তু আমার গোলাপের কি হবে? এই গোলাপের যে সহস্র কণ্টকাঘাত আমি সহ্য করেছিলাম! আমি যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এক অভিনব অদ্ভুত জগতে পরিভ্রমণ করছিলাম। সেখানে সকল জিনিষ পরিবর্ত্তিত হয়ে গাঢ়তর হয়ে উঠছিল। আমাদের সত্ত্বা সেখানে যেন গভীর হ্রদের মত এক রহস্যময় উৎস মুখে এসে মিশেছে।

অবগুণ্ঠন-অপসৃত বধূর মুখমণ্ডলের মত উজ্জ্বল শশধর এই প্রান্তরের অপর পার্শ্বে কুজ্ঝটিকা ভেদ করে চলেছে। রজনী দিবসের মত সমুজ্জ্বল। হ্রদের অবশিষ্ট অংশ স্বর্ণাভ সেতুর মত পুণ্যতীর্থ ভূমির দিকে চলে গেছে। আমি অর্দ্ধ সমাপ্ত মালিকাহস্তে প্রাচীরের পার্শ্বে চলে গেলাম। কুজ্ঝটিকা যেন স্রোতের আকারে পরিণত হয়ে ফতেপুরের দিকে চলেছে, তারপর সেই কুজ্ঝটিকা তৈমুরের যুগে নিহত রাজপুত বাহিনীতে রূপান্তরিত হ'ল—রাজপুত বাহিনী এসেছিল সম্রাট আকবরের ও জাহাঙ্গীরের সময় সমরখন্দ থেকে, বল্ক থেকে, উজ্জয়িনী থেকে। তাদের দেহে রক্ত চিহ্ন নাই, তাদের দেহে হরিদ্রাভ পরিচ্ছদ নাই; তাদের শ্বেত পরিচ্ছদ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যেন তারা কোন গোপন বার্ত্তা বহন করে এনেছে…আজ রজনীতে চন্দ্র যেন তাদের আকাশপ্রদীপ হয়ে উঠেছে।

আমার অজ্ঞাতে আমি পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আমার মুক্ত গবাক্ষপথের অদূরে "রাও"য়ের ক্ষুদ্র প্রাসাদের ছাদ দেখতে পেলাম। নিম্ন প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলাম "রাও"। আমি নতজানু হয়ে পাষাণ প্রাচীরের পার্শ্বে আত্মগোপন করলাম। আমি নিশ্বাস নিতেও সাহস করিনি—কারণ হয়ত "রাও" আমার উপস্থিতি জানতে পারবেন। অবশ্য আমার দেহের প্রতি পরমাণু এক আকুল আকাঙ্ক্ষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—"রাও" যেন আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন!

কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নিশ্চল, তাঁর দৃষ্টি বহুদূরে অসীমের পানে

যেন কোন বার্ত্তার সন্ধান করে ফিরছিল। আমি দেখেছিলাম তাঁর নয়নে এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল সৈন্যবাহিনী, আসন্ন সংগ্রামে এই সৈন্যদল তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াবে, তারা আমাদের সাহায্য করবে।

তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বায়ুর আবেগে একটি দীপ নিভে গেল। দুঃখ আবার আমায় অভিভূত করে তুলল, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত । আমি অকস্মাৎ সকলকে দেখতে পেলাম—উদ্ধত অধৈর্য্য দারা, বিলাসী ধৈর্য্যহীন শুজা, কূটবুদ্ধি অদমনীয় আওরঙ্গজেব, বীরবাহু স্থূলবুদ্ধি মুরাদ—আর আমার রুগ্ন পিতা। সেখানে আমি একমাত্র নারী।

আমি আমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। কোয়েল আমার কক্ষের মুখে দরজার পার্শ্বে শয়ন করেছিল। অন্য দরজার মধ্য দিয়ে "রাও"-র কক্ষে প্রবেশ পথ। আমি কি জীবনে আর তাঁর দর্শন পাব না? যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক যোদ্ধা প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের সময় নির্ব্বাচন করে নেয়—আমার জন্য কি "রাও" একটি মুহূর্ত্তও ব্যয় করবে না? আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি; না, কোন কথাই ত হয়নি! আমি গিয়ে দরজার পার্শ্বে দাঁড়ালাম—অতি মৃদু স্পর্শে অর্গলের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলাম।

আমি জানি না—আজও আমি জানি না, কি করে দুয়ার খুলে গেল। আমি নিদ্রা-ভ্রমণকারীর মত নিজের অজ্ঞাতে কক্ষান্তরে গিয়ে উপস্থিত ছি…

"রাও" দ্বারপ্রান্তে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে নিদ্রিত, তাঁর মস্তকে উষ্ণীষ ছিলনা—তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রকিরণ-সমুদ্ভাসিত, আমি তাঁকে কখনো এত সুন্দর দেখিনি। তাঁর অধর প্রান্তে হাসির চঞ্চলতা না দেখলে আমি মনে করতাম, হয়ত তিনি অনন্তনিদ্রায় শায়িত। আমার বাহু বেষ্টিত মালার পুষ্পগন্ধে যেন সমস্ত কক্ষটি আমোদিত হয়ে উঠেছিল……

চন্দ্রালোকে যেমন প্রকৃতি তার পট পরিবর্ত্তন ক'রে, আমি তেমনি আমার দ্বারপ্রান্ত থেকে, দিবসের জাগ্রত পৃথিবী থেকে, রাত্রির রহস্যময় পৃথিবীতে রাতের প্রকোষ্ঠে অবতীর্ণ হলাম। অতি ধীরে আমি অবসন্ন আবেগে তাঁর পার্শ্বদেশে বসে পড়লাম—আমার সর্ব্ব শরীর পাষাণ তলের উপর এলিয়ে পড়ল। আমার মস্তক "রাও"এর বসন প্রান্তের মধ্যে অবশায়িত। আমার মনে হ'ল যেন ডুবে যাচ্ছি—ডুবেই যাচ্ছি—যেমন সেই দিন চন্দ্রালোকে আমার অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু আজ আমি যেন শান্তির সাগরে ডুবে গেলাম। আমি এক অজ্ঞেয় অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। আমার জীবনের সেই একটি মুহূর্ত্ত যেন সহস্র রজনীর পরিপূর্ণতায় ভরে গেল। আমি আমার কক্ষ প্রাচীরের পার্শ্বে ইতস্ততঃ পদধ্বনি শুনতে পেলাম, আমি উঠে বসলাম। "রাও" তাঁর মস্তক সঞ্চালন করলেন এবং নিদ্রার মধ্যে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন।

দ্রুতপদে অথচ শান্তমনে আমি গাত্রোত্থান করলাম, পদক্ষেপে আমি স্বর্গ বিচ্যুত হলাম! কম্পিত কপোল, ভীত হৃদয়ে আমি আমার কক্ষে ফিরে এলাম; কিন্তু দেখলাম, আমার অর্দ্ধসমাপ্ত সেই মালাখানি পশ্চাতে ফেলে এসেছি।

আমার কক্ষের প্রাচীর অতিক্রম করে কী একটি 'নিশাচর' পাখী চলে গেল? এ কার পদধ্বনি?……আমার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। আনন্দ, দুঃখ, ভয়—কিছুই যেন আমার আর সহ্য করবার শক্তি নেই। আমি সতরঞ্চের উপর কুশানে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম—গভীর নিদ্রা আমায় কোলে তুলে নিল।

প্রভাতে আকাশ-ভেদী এক তীব্র চীৎকারের শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। কোয়েল আমাকে সংবাদ দিল যে, রাত্রির প্রহরীরা একজন নিরপরাধ লোকক্কে প্রাসাদে প্রবেশ কর্ত্তে চেষ্টা করছিল বলে হত্যা করেছে।

আমি কিছু শুনতে পাইনি, কোন দুঃখই আমার হল না। এইটুকু মনে হল যে গত রাত্রিতে এই ব্যক্তিরই চীৎকারে আমার ভীতি সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণার তীব্র চীৎকার তখনও আমার কর্ণে ঝঙ্কার দিচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রাও কোথায় ?"

প্রত্যুষে তিনি সসৈন্যে প্রাসাদ ত্যাগ করে গেছেন। আমি আমার শয়নকক্ষে যাওয়ার পূর্ব্বে কক্ষে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার মালাখানি সেখানে নেই। এই মালা কি আবার আমাদের মধ্যে নূতন যোগসূত্র রচনা করবে ? আমি আবার তাঁর সঙ্গে কি করে সাক্ষাৎ করব ?

আমরা নহবৎখানা অতিক্রম করে এসেছি, পথে দেখলাম একটি শবযাত্রা। আমার মনে হল একটি দরিদ্র হিন্দুর মৃতদেহ নদীতীরে দাহ করবার জন্য নিয়ে চলেছে। আমি হাজীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মৃত লোকটি কে ?" সে উত্তর দিল, "গত রাত্রির নিহত ব্যক্তি।" এই লোকটি ছিল জড়বুদ্ধি কিন্তু তার স্বর ছিল সুমিষ্ট। বেগম সাহেবাকে রাত্রি প্রভাতে সঙ্গীত শোনাতে চেয়েছিল—এই তার অপরাধ। তার [বু]কের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একখানি মূল্যবান কঙ্কন। প্রহরীর ধারণা সে নিশ্চয় চুরি করেছিল। কিন্তু তার মাতা বল্ল, "আমার পুত্র [জ]ীবনে কখনো চুরি করেনি ? সে কেবল দানই করেছে।" আমি [আ]মার হাজীরকে ফরমান লিখতে বল্লাম—"আমি মৃতব্যক্তিকে এই [ক]ঙ্কন দিয়েছিলাম তার সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে, তার মাতাই সে কঙ্কনের [অ]ধিকারিণী।" তারপর আর একখানি কঙ্কন তাকে উপহার দিলাম। [এ]ই গুণী ব্যক্তির মৃত্যু আমার মনের উপর ভীষণ অমঙ্গলের গভীর [ছ]ায়াপাত করে দিল।

গ্রীষ্মতাপদগ্ধ দিনে যেমন সমস্ত পৃথিবী নিঃশ্বাসের জন্য কাতর হয়ে উঠে, আমি দেখলাম, সমস্ত আগ্রানগরী উত্তেজনায় তেমনি চঞ্চল হয়ে

উঠেছে। কেউ আনন্দে ভবিষ্যতের আকাশকুসুম রচনা করে চলেছে, আবার কেউ ধারণা করেছে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী……

পঙ্গপালের মত সত্য মিথ্যা নানাপ্রকার জনশ্রুতি আগ্রা সহরকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। আমি শুনলাম—আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ নিজেদের অপরাজেয় মনে করছে, তাঁদের সৈন্যগণ উজ্জয়িনীর যুদ্ধ জয়ের গর্ব্বে উল্লসিত। তারা ঘোষণা করেছে যে, সাম্রাজ্য জয় করে তারা পারস্য ও তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। বিশ্বাসঘাতকের দল ভিন্ন আর কারো মস্তিষ্ক স্থির নাই। আওরঙ্গজেব বলেছেন যে আমার পিতার সৈন্যদলে সহস্র সহস্র বিশ্বাসঘাতক সৈন্য রয়েছে।

আমি আমার ভ্রাতা দারার সাথে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় একখানি পত্র পেলাম—রাণা ছত্রশালের পত্র। কয়েকটি ছত্রে দ্রুত লিখিত পত্রে তিনি বলেছেন যে, যদি শাহজাদা দারাকে সৈন্যদলের একচ্ছত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত না করা হয় তবে শাহজাদা সম্রাটের সম্মুখে আত্মহত্যা করবেন। আমার মনে হয়, সম্রাটের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের আশা নেই এবং দারার সঙ্কল্প তিনি সমর্থন করবেন না। পত্রের শেষে এক অনুরোধ "রাও" জানিয়েছেন যেন আমি আমার হস্তাক্ষর-সংযুক্ত একখানি স্মৃতিচিহ্ন তাঁকে উপহার দিই। তিনি সেই স্মৃতিচিহ্ন আমরণ নিজের অঙ্গে কবচ করে রেখে দেবেন। সমুদ্রে আন্দোলিত অর্ণবপোত ভূভাগদর্শনে যেমন আনন্দিত হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি তাঁর শেষ কথাগুলিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আভাস পেলাম—কিন্তু তারপর?

আমি আমার প্রাসাদশিখরে একটি কক্ষে বসেছিলাম, সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের লালকেল্লা অতিক্রম করে আমার গৌরবর্ণিনীর অন্তঃপুরিকা (৬৭) ভবনের তোরণ অতিক্রম করে আমি পিতার কাছে উপস্থিত হলাম। এই অন্তঃপুর তোরণ ভারতীয় হীরকশিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত।

(৬৭) মুঘলদের মধ্যে ইউরোপীয় নারী অন্তঃপুরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। আকবর,

এখানে প্রত্যেকটি জিনিস অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল, অতি সহজ।—আমি ফতেপুর-শিকরীর স্বপ্নপুরী স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লাম।

যমুনার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্রকক্ষে কুশানে দেহ বিন্যস্ত করে আমার পিতা বিশ্রাম করছিলেন। সম্রাটের মুখমণ্ডলে যেন একটা নিঃসঙ্গ ভাব। সাধারণ মানুষ তাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না। এই ভাব আমি তাঁর যৌবনেও লক্ষ্য করেছিলাম। আমার সঙ্গে সাক্ষ্য হওয়া মাত্রই আমি ফতেপুর শিকরীর একটি ফুল তাঁকে উপহার দিলাম। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অতি সামান্য উপহারেও তিনি উল্লাস অনুভব করতেন। আমি ভাবলাম এই কি সেই সম্রাট শাহজাহান? প্রজাবর্গ কি মানুষরূপে তাঁকে ভালবাসতে পারেনি?

তিনি আমাকে বলেন, "আমি শাহজাদা দারার হস্তে সম্পূর্ণ শাসনভার অর্পণ করেছি। কারণ পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দারা তার পিতার রাজ্য রক্ষা করতে পারবে এবং তার পিতাকে আওরঙ্গজেবের কারাগার থেকে উদ্ধার করতে পারবে।" এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর শীর্ণ মুখমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যদলসহ সুলেমান শুকোর অনুপস্থিতি সম্রাটকে আতঙ্কিত করেছিলাম। রাজা জয়সিংহের উপদেশে সৈন্যদলসহ আগ্রায় উপস্থিত না হয়ে সুলেমান কেন শাহ শুজার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল?

আমি উত্তর দিই নি—শুধু চিন্তা করলাম। অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ একজন বিশ্বাসী সামন্ত। কিন্তু একদিন দারা তাঁকে গায়ক বলে উপহাস করেছিলেন। জয়সিংহ কি শাহ শুজাকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে না? আমি পিতার করপুটে আমার ললাট স্থাপন করলাম। কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন তাঁর হস্তে

জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এমন কি আওরঙ্গজেবেরও ইউরোপীয় অন্তঃপুরিকা ছিল। সেই শ্বেতাঙ্গিনী মহলের নাম ছিল ফিরিঙ্গী মহল।

আপেলের আশ্চর্য্য গন্ধ নেই। দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে আমি সেই স্থান ত্যাগ করলাম।

প্রাসাদের উচ্চ শৃঙ্গ থেকে আমি বিশাল সৈন্যদলের একাংশ দেখতে পেলাম। এই সৈন্যদলটি অত্যন্ত দ্রুত সমবেত হয়েছে। অশ্বারোহিগণ অস্ত্র এবং পরিচ্ছদে সুসজ্জিত।

দলের পর দল সৈন্য চলেছে। সেই মুহূর্ত্তে আমি কল্পনা করেছিলাম, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। পরের দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দ্রোদয়ে আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের সঙ্গে তাজমহলের পাশে সাক্ষাৎ করতে যাব। কিন্তু আমি সংবাদ পেলাম যে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত সৈন্য অগ্রসর হয়ে আসছে। সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও শাহজাদা দারা তাঁরা পুত্র সুলেমানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন নি। সর্ব্বত্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।

আমাদের সাক্ষাতের সময় আগতপ্রায়। আমি আদেশ দিলাম যেন কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী উদ্যানের প্রবেশ পথ রক্ষা করে। হাজীরও কোয়েল প্রাসাদের সান্নুদেশে প্রহরীর কাজ করবে। তারপর আমি ধীরপদে সাইপ্রাস বীথির মধ্যে দিয়ে স্বল্পপরিসর পরিখার পার্শ্ব অতিক্রম করে সমাধির দিকে অগ্রসর হলাম। গলিত তাম্রসারপূর্ণ গভীর কুপের অভ্যন্তরে অস্তায়মান সূর্য্যের শেষরশ্মি আগ্রার উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে দিয়ে তার শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছিল। এই রক্তিমাভা কি কোন আসন্ন খাণ্ডবদাহের সূচনা করছে? সন্ধ্যার আকাশ এক নববায়ু প্রবাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অপর তীরে ক্ষীণ সবুজাভ গোলার্দ্ধে চন্দ্র উদিত হয়েছে। এর পূর্ব্বে সাইপ্রাস বীথি কখনও এমন গম্ভীর শ্রেণীবদ্ধভাব ধারণ করেনি। এর পূর্ব্বে তাজমহল কখনও সাইপ্রাস বীথির অন্তরালে এমন গম্ভীর তীব্র শুভ্র রূপ পরিগ্রহ করে নি—এ যেন অপ্সরাপুরীর প্রাসাদ। পৃথিবীর কোথাও বাতাস এমন সুমিষ্ট গোলাপ
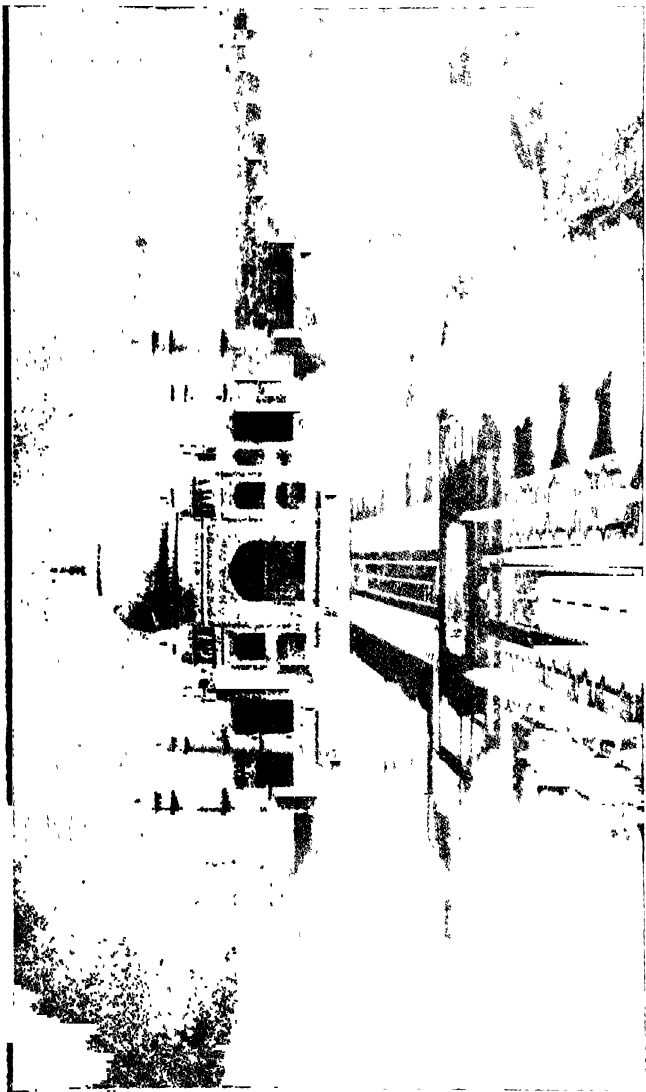
তাজমহল

১৩৫ পৃঃ

ও যুথীগন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, কোথাও বিহঙ্গম এমন সুমিষ্ট স্বরে সঙ্গীত রচনা করে নি। বিহগকুল তাদের জীবনের সঙ্গীত বিভিন্ন বৃক্ষ-পত্রে ইতস্ততঃ করে তুলছে।

আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ। আমার মনে হ'ল, আমার মাতা তাঁর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুষমা নিয়ে অতীত দিনের চেয়েও আমার অত্যন্ত সন্নিকটে উপস্থিত। সবুজ পত্রপল্লবে ধ্বনিত হ'ল—স্রোতস্বিনীর জলগুল্মের অন্তরালে পত্রনিম্নে কলনাদ ধ্বনিত হ'ল—"তোমরা সকলেই আমার সন্তান এই বিসম্বাদ কেন?" আগ্রার প্রাসাদের পশ্চাতে অতি ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকীরণ করে চন্দ্রিমা এলিয়ে পড়েছে। জননী বিধাতা কি তোমাকে চাঘ্‌তাই বংশের রাজমুকুটের চারিপার্শ্বে তেজোময় জ্যোতিষ্করূপে সৃষ্টি করেছিলেন শুধু ভারতবর্ষে এসে নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার জন্য? তুমি যেদিন অন্তর্হিত হয়েছিলে, তোমার পশ্চাতে এসেছিল শুভ্র পাষাণের পর পাষাণ, স্বর্ণখণ্ড মণিমুক্তা, শীষমহলের অয়নখণ্ড—তাই সংযুক্ত করে গ্রন্থিবদ্ধ করে রচিত হল তাজমহল। আবার সম্রাট রক্ত সংযুক্ত করে রচনা করলেন, তাঁর নিজের সমাধি। (৬৮) তুমিই একমাত্র তাকে সন্ধান দিয়েছিলে শক্তির। তারপর এসেছিল বহু নারী; তারা করল সম্রাটের শক্তির অপচয়। (৬৯)

---

(৬৮) তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার অপর তীরে শাহজাহান আরম্ভ করেছিলেন নিজের সমাধি রক্তপ্রস্তর দিয়ে। সেই রক্তবর্ণ সমাধি হবে সম্রাট শাহজাহানের শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। আর তাজবিবির সমাধি হবে শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের—শুচি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দুইটি সমাধিকে সংযুক্ত করে দেবে একটি ঘনকৃষ্ণ মর্ম্মরের সেতু। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর হবে মৃত্যুর প্রতীক। শাহজাহানের সমাধি সম্পূর্ণ হয় নি, কারণ তার পূর্ব্বেই শাহজাহান হলেন বন্দী। আওরঙ্গজেব বল্লেন—বন্দী শাহজাহানের আবার বিলাস কেন? তবু মৃত্যুর পরে আওরঙ্গজেব কৃপা করে শাহজাহানের মৃতদেহ তাজ-বিবির পার্শ্বে সমাধিস্থ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুগ্রহ বৈকি।

(৬৯) অনেকের ধারণা শাহজাহানের পত্নী একমাত্র তাজবিবি, উহা ভুল। অন্যান্য মুঘল সম্রাটের অনুকরণে শাহজাহানের ছিল পত্নী বহু—বিবাহিত ও বিবাহাতিরিক্ত।

আমি শুনতে পেলাম বিরাট অঙ্গনের দ্বার কখনও উন্মুক্ত, কখনও অর্গলবদ্ধ ; শুনতে পেলাম আমার পশ্চাতে মর্ম্মর পথের উপর মনুষ্য পদধ্বনি—সেই চঞ্চল পদক্ষেপের ভাষা আমার পরিচিত। আমি বাস্তবের সম্মুখে উপস্থিত হলাম—যেন একটি সঙ্গীত আমাকে বর্ত্তমানের সম্মুখে টেনে এনেছে। আজকের সন্ধ্যায় ছত্রসাল সম্পূর্ণ শ্বেতবসন পরিহিত। তাঁর বাহুতে হরিদ্রাভ বাজুবন্ধ। আমাকে অভিবাদনের সময় দেখতে পেলাম তাঁর উষ্ণীষনিবদ্ধ রয়েছে একটি সম্পূর্ণ মুক্তাহার—যেন আমাকে দেখবার জন্যই এই আয়োজন।

আমরা পরিখার পার্শ্বে সরোবরের নিকটে উচ্চ আসনে উপবেশন করলাম। আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। "রাও" কখনও কোন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ পালন করেন নি। সাম্রাজ্যের সেনাপতিরূপে শাহজাদা দারার ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি জানতেন, ত্রিশ সহস্র মুঘল অশ্বারোহী সৈন্য শত্রুর প্রতি প্রসন্ন। অথচ সৈন্যদলে ছিল—পাচক, ভৃত্য, চণ্ডাল, নরসুন্দর (৭০)—তারা কখনও যুদ্ধাস্ত্র স্পর্শ করে নি। তারা মৃত্যুবরণে অনভ্যস্ত—কিন্তু আগামী কাল প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা অবধারিত। এই সিদ্ধান্তের অগ্রপশ্চাৎ নাই।

চম্বল নদী ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল। এইখানেই বিরোধী সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্র স্থির হয়েছে। নদীর সমস্ত সেতু সুরক্ষিত। একমাত্র রাজা চম্পৎ রাওয়ের রাজ্যভাগে অবস্থিত সেতু সুরক্ষিত। কারণ, রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে শত্রু সৈন্য অতিক্রম

(৭০) মুঘল যুগে স্থায়ী সৈন্য ব্যবস্থা থাকলেও যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বেশীর ভাগ সৈন্য সংগ্রহ করা হত। মনসবদারগণ যে কোন লোকই যুদ্ধারম্ভে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত। সুতরাং যুদ্ধে জয় করা অপেক্ষা পলায়ন ব্যাপারেই তাদের পটুতা প্রদর্শিত হত।

করবার অনুমতি দেবেন না। ছত্রশাল মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, "অবশ্য যদি রাজা চম্পক রাও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।"

খলিলুল্লা খান অপেক্ষা দুষ্ট শত্রু আর কেউ নাই। "রাও"এর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, খলিলুল্লা অত্যন্ত অপকৌশলী। এই খলিলুল্লা খানের অধীনে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ন্যস্ত হয়েছে। "রাও" রুদ্ধ বিরক্তির স্বরে বল্লেন, "যদি শাহজাদা আজ খলিলুল্লার মিষ্ট কথায় না ভোলেন, তবে আওরঙ্গজেবের কামানের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে না।" তারপর তিনি আমাকে রাত্রির দ্বিতীয় যামের পূর্ব্বে অনুরোধ করেন—"শাহজাদী, আপনার ভ্রাতাকে পুনরায় সতর্ক করে দিন!"

আমরা কিছুক্ষণ নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করলাম। তারপর আমি বলে উঠলাম, "রাজপুত কি করবে? রাও রাজা,—আপনার বিখ্যাত অশ্বারোহিবাহিনীর, রাজা রামসিংহের সৈন্য, তারা কি করবে?" প্রথমে "রাও" কোন উত্তর দেন নি!

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইলেন আমার রাখিবন্ধ ভাই, তারপর বললেন, "ঐ দেখুন তাজমহলের দীপ জ্বলছে অনির্ব্বাণ, প্রেমমুগ্ধ চিত্তের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য।" তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। উত্তেজনায় তাঁর মুখ রক্তিমাভা ধারণ করেছিল। তিনি বল্লেন, "রাজকুমারী জানেন যে আপনার পিতার সম্মানার্থে উদয়-পুরের দেবমন্দিরে একটি অনির্ব্বাণ দীপ জ্বলে। রাজস্থানের সৈন্যদল পরিপূর্ণ আগ্রহে সম্রাটের পতাকাতলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।"

আমরা তাজমহলের দিকে অগ্রসর হলাম। "রাও" সমাধি পরি-দর্শন করলেন, আর আমি "রাও"কে নিরীক্ষণ করলাম। মৃদুকণ্ঠে তিনি বল্লেন, "পুরুষ এই পৃথিবীর শাসন করে। পুরুষের শক্তি সৃষ্টি করে, আবার ধ্বংসও করে—নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করে। পুরুষ শক্তির ইঙ্গিতেই আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা বুঝি না যে এই

শক্তির পশ্চাতে আরও শক্তিময়ী শক্তি আছে, সে শক্তি নারীর। যখন নারীর সে শক্তি অঙ্গবিহীন দেবতার পদধ্বনির তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে, তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য রূপান্তরিত হয়ে যায়।"

"রাও" কি চম্পক মালিকা দেখেছিলেন? হঠাৎ সুমিষ্ট পুষ্প গন্ধের তীব্রতায় বাতাস ভরে গেল। এ গন্ধ কি সমাধি মন্দিরের শতদল উদ্যান থেকে এসেছে? এক অব্যক্ত কমনীয় ভাব ও অদম্য চিন্তা শক্তি আমাকে আমার বহু উর্দ্ধে টেনে নিয়ে গেল। প্রাসাদ প্রাচীরের সুগভীর গম্বুজ তাহার আশ্রয় বিহীন প্রেমিককে আশ্রয় দেয়; "রাও" তাঁর হরিদ্রাভ উষ্ণীষ মর্ম্মর তলে বিছিয়ে দিলেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলব—হয় এখনি, নচেৎ আর জীবনে নয়। আমার ভয় হল আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলব। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! নজবৎ খান যাকে আমি কখনও চিন্তা করিনি, সহসা আমার কল্পনায় উদিত হল—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, অশুভ ইঙ্গিত—তাঁর নয়নে পরিস্ফুট। আমি কথা বলবার পূর্ব্বেই নিজের চিন্তা অনুসরণ করে "রাও" অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন, "আওরঙ্গজেবের সেনা-বাহিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমি নজবৎ খানের অপসরণ চাই।"

আমি আমার বাহুতে ভর দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" "রাও" সম্মুখে অগ্রসর হলেন, নিমিলিত-নয়ন শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমি তাকে ঘৃণা করি।" আমি অবাক হয়ে রইলাম।

তিনি কি শুনেছেন? তারপর মনে পড়ল আমি যখন ফতেপুরে নজবৎ খানের নাম উচ্চারণ ক'রেছিলাম, "রাও" তখন চঞ্চল হয়ে উঠে-ছিলেন। তিনি যে আর কি শুনেছিলেন—তা' আমি জানি না। আমি স্থির করলাম, আমাদের দুজনের মধ্যে নজবৎ খানের ছায়ারও স্থান হবে না। আমি আমার অবগুণ্ঠন অপসরণ করলাম। তিনি আমার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করুন। তিনি জানুন যে নজবৎ খানের মত মানুষকে আমি বরণ করতে পারি না।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "আপনার কি সেই পত্রের কথা স্মরণ আছে? সে পত্র আমি সর্ব্বদা আমার বক্ষে বয়ে বেড়াই। সেই পত্রে লেখা হয়েছিল—যদি আমি সংযুক্তা হতাম······"আমি এখানে থামলাম। ছত্রশালের মুখমণ্ডল শ্বেতমর্ম্মের প্রচ্ছদপটে কৃষ্ণ পাংশু বর্ণ ধারণ করল। আবার আমি বল্লাম, "মনে পড়ে সেই গোলাপ···?" কিন্তু আমার সমস্ত শক্তি আমি হারিয়ে ফেল্লাম, আমি প্রাচীর গাত্রে অবসন্ন দেহভার এলিয়ে দিলাম।

তিনি যে বহু দূর থেকে উত্তর দিলেন, "আমার মনে পড়ে বহু, বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।" তিনি চক্ষু উন্মেলন করলেন। তাঁর সে দৃষ্টি আমি কখনও ভুলব না—যখন ঈশ্বরের জ্যোতিঃ মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন আর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন, হাঁ আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমি তখন তরুণ ছিলাম এবং স্বপ্নে বিশ্বাস করতাম। জাহানারা বেগম, হিন্দুস্থানের রাজকুমারী, আমার গোপন রাজ্যের রাণী, জাহানারা বেগম। আজকে আমার সময় হয়েছে, আমি জেনেছি যে দিবসের তীব্র আলোর সম্মুখে সুন্দরতম স্বপ্নও মলিন হয়ে যায়। স্বপ্ন শুধু চন্দ্রালোকেই ক্ষণিকের অতিথি। যুদ্ধ আমার ললাটে ক্ষত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীর। কিন্তু জীবন আমার হৃদয়ে ক্ষত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীরতর। স্বপ্ন বাস্তব-রাজ্য হ'তে যত দূরে স'রে যায় ততই আরও সুন্দর প্রতিভাত হয়। সেখানে কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই······"

জীবনটা আমার কাছে প্রহেলিকা। আমরা নীরবে ব'সে ছিলাম। আমার মনে হল অকস্মাৎ যেন আকাশের সব আমাদের মাথার উপর থেকে ঊর্দ্ধলোকে সরে যাচ্ছে। আমি অনুভব করলাম, আত্মত্যাগই সপ্তস্বর্গের পথ খুলে দেয়। আমি অনুভব করলাম, আমাদের মধ্যে স্থূল

দৃষ্টিতে পার্থক্য বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের আত্মা নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম অতি শান্তভাবে—"আমরা কি তাজমহলে প্রবেশ করব?"

নক্ষত্রের গতি কে প্রতিরোধ করতে পারে? প্রাসাদের প্রবেশপথে মোল্লা কোরাণ আবৃত্তি করছিল। হাজীর মোল্লাদের ডেকে নিকটবর্ত্তী "লাল মসজিদে" নিয়ে এল। সমাধি মন্দিরে তখন আলো জ্বলছিল। সে দিন ছিল শুক্রবার।

প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে আমার মাতার সমাধি স্তম্ভের উপরে মূল্যবান মুক্তাখচিত এক খণ্ড বস্ত্রের আবরণ দেওয়া হয়। আমি রাখীবন্ধ ভাইকে বল্লাম, "আপনি আপনার একটি প্রিয় শব্দ উচ্চারণ করুণ, যেন তাজমহলের প্রতিধ্বনি আপনার শব্দের উত্তর দেয়।"

আমি শুনলাম—আমার নাম তাজের অভ্যন্তরে সহস্র দেবদূতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি বল্লেন, "এমনি করে যেন জাহানারার নাম পৃথিবীর অপর প্রান্তে অভ্যর্থিত হয়।"

আমার লেখনী অধিক অগ্রসর হতে পরাঙ্মুখ হয়ে উঠেছে। আমি অনেক বিষয়ে অনেক কথাই লিখিতে পারি, কিন্তু সেই গম্বুজের নিম্নে আমাদের কথা বিনিময়ের বিষয়ে আর লিখতে পারছি না...

কোন বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়কে নিকটতর করতে পারত না।

যদি দারা গৃহযুদ্ধে জয়ী আর ছত্রপাল জীবিত থাকেন তবে তিনি হিমালয়ের প্রান্তদেশে এক পার্ব্বত্য মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করবেন। তিনি স্থির করেছেন—চম্বল নদীর যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

আমরা সাইপ্রাস বীথির মধ্যে দিয়ে সেই বিরাট প্রবেশ তোরণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছি...সমাধির দিকে যাত্রার সূচনা থেকে আরম্ভ করে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমার মনে হল যেন আমরা এক গহন ধর্ম্মরাজ্যের বহু উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলাম।

বিদায় সম্ভাষণের সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি সেই পবিত্র পর্ব্বতে তীর্থ যাত্রা করতে পারব ?"

তাঁর নয়নে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আপনার জন্য পর্ব্বতের পাদদেশে অপেক্ষা করব। জাহানারা, যদি সেখানে না পারি তবে সূর্য্যালোকে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"

সেই তাঁর শেষ বাণী আমার উদ্দেশে।

নবম স্তবক

…………………

অস্ত্রের বর্ষাধারায় হিন্দুস্থানে নর্ম্ম উদ্যানে ফুল ফুটেছিল,
সেখানে মানুষের অস্থি ছিল শুভ্রযূথি, আর রক্ত ছিল কমল।

(আন্‌সারী)

………………!

বায়ুমণ্ডল শুভ্র তরবারী দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল,
সেই তরবারী তৈরী হয়েছিল ঘন পদ্মরাগমণি দিয়ে।

(চান্দ্‌বরদাই)

………………!

হস্তীর বিকট চিৎকার অশ্বের হ্রেষারব,
ঐ শোন সৈন্যের আর্ত্তনাদ,…………ঐ ঐ ঐ! (মকৃফী)

* * * *

পরের দিন প্রভাতে আমরা প্রাসাদ-শিবির হতে দেখলাম এক বিরাট সেনাবাহিনী চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে; যুবরাজ দারার রাজহস্তী রাজপুত অশ্ববাহিনী-মধ্যে পর্ব্বতের মত উচ্চশির। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

বুন্দীরাজের অশ্বারোহীদল চলেছে—বাহিনীর পশ্চাতে বাহিনী-সৈন্যদলের কুম্‌কুমরাগ পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছিল তারা জয়লাভ না ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। আমার শরীরে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

আমার যতদূর দৃষ্টি যায় আমি কেবল ছত্রশালের হস্তী অবলোকন করলাম। আমি জান্‌তাম তাঁর পশ্চাতে ছিল তাঁর অশ্ব—নাম

"যবদ্বীপ"। চৌহানবংশের প্রতিষ্ঠাতা গর্গার অশ্বের নামও ছিল "যবদ্বীপ"। অশ্বের ললাটে বিলম্বিত ছিল একটি বৃহৎ রক্তাভ ওপেল প্রস্তর। আমিই সে প্রস্তরখণ্ড তাঁকে আমার স্মৃতিস্বরূপ পাঠিয়েছিলাম।

দামামা ধ্বনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, সঙ্গীত দূরে মিলিয়ে গেল; শেষে উষ্ট্রও চক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেল। আমি আমার পিতার নিকট উপস্থিত হলাম; তাঁকে শান্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, সম্ভাব্য সকল অশুভ জিনিষই তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য আমি সম্রাট বাবরের পুত্রচতুষ্টয়—হুমায়ুন, কামরাণ, আস্‌কারি, হিন্দালের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত করলাম। কামরাণ আওরঙ্গজেবের মত সকলকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং দরবেশ। তিনি হুমায়ুনকে সিংহাসন চ্যুত করতে চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য বাবর হুমায়ুনকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কামরাণ সফল হন নি।

পিতার চক্ষুকোটর হতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি যেন কোন বিশেষ কেন্দ্রের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, অকস্মাৎ আমার প্রতি তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। সেই দৃষ্টি আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করল, তিনি উত্তর দিলেন:—

"সম্রাট হুমায়ুন কামরাণের চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন, কারণ কামরাণ চাঘ্‌তাই সন্তানের প্রাণনাশ করেছিলেন। মির্জ্জা আসকারী যদিও শিশু আকবরকে অপহরণ করেছিলেন, তবু তিনি সজ্জন ছিলেন, আকবরের প্রতি সুব্যবহার করেছিলেন, মির্জ্জা হিন্দাল সম্রাট হুমায়ুনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। তৈমুর বংশ কি ভেবেছে যে তাদের বংশের নিঃশেষ হয়ে গেছে?"

* * * *

আমি আমার অপরাধ চিন্তা করলাম! আমার অপরাধের শাস্তি

হচ্ছে। সেই অপরাধে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে। আমি লজ্জায় নীরবে মাথা নত করলাম। শায়েস্তাখানের স্ত্রীকে আমিই সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সাহায্য করেছিলাম—আজ আর সে নারীর জীবনের কোন মায়া নাই। শায়েস্তাখানের প্রতিশোধ স্পৃহা......উঃ!

তারপর কয়েকদিন পর্য্যন্ত দেখলাম একটি নক্ষত্র আমাদের মাথার উপরে ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথে চলেছে এবং প্রতিটি ঘটনাই সে নক্ষত্রের পানে ছুটেছে।

আমার পিতা শাহজাদা দারাকে সুলেমান শুকোর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই তরুণ সেনাপতি শাহ্ শুজাকে অনুসরণ করে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আমাদের শত্রু ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছিল। যদি সুলেমান শুকো যথাসময়ে এসে সসৈন্যে উপস্থিত হতেন, তবে খলিলুল্লা খান ও তাঁর অশিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন হত না।

প্রতিদিন গ্রীষ্মের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়।

শেষে বিরাট সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদবাহক শিবিরের সংবাদ নিয়ে এল; বিভিন্ন রকমের সংবাদ আস্‌ছিল, সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা খুব সহজ ছিল না।

কিন্তু আজ আমি অনেক ঘটনাই বলতে পারি, কারণ আমি পরে সে সংবাদ জেনেছিলাম।

শাহজাদা দারা চম্বলনদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করেছিলেন। দূর থেকে মনে হয় যেন স্বপ্নের দেশে এক বিরাট নগর—অগণিত শিবির বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকা, প্রবহমান জনস্রোত। দুদিন পরে সৈন্য দৃষ্টিগোচর হয়। শত্রুর প্রতি-আক্রমণের জন্য দারার সেনাপতি অনুমতি প্রার্থনা করলেন, কিন্তু দারা তখনও তাঁর পুত্র সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সুলেমান তখনও আসেনি......।

চম্বল নদীর উপরে সমস্ত সেতুপথ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। একমাত্র চম্পত রাওয়ের রাজ্যসীমার মধ্যে অবস্থিত সেতু অরক্ষিত ছিল। রাজা চম্পত রাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শত্রুদিগকে সেতু অতিক্রম কর্ত্তে অনুমতি দেওয়া হবে না। দারার শিবিরের কয়েক ক্রোশ দূরে একটি অরক্ষিত সেতু আছে, সে সংবাদ আওরঙ্গজেব জানতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও সংবাদ জানা গেল যে রাজা চম্পত রাও লোভী। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতপদক্ষেপে আওরঙ্গজেব আট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সুরক্ষিত নদীর অপর তীরে উপস্থিত হলেন।

এবার দারার শত্রু-আক্রমণের সুযোগ। নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর সৈন্যদলের প্রধান অংশ তখনও এসে উপস্থিত হয় নি। দারার সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম বল্লে—দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করা হউক। কিন্তু খলিলুল্লা খান বল্লেন—"যদি দারা তার সৈন্যদল এখন প্রেরণ করেন, তবে বিজয়ের গৌরব হবে সেনাপতিদের, সেই বিজয় হবে দারার অসম্মান, সুতরাং অপেক্ষা করা উচিত······।"

আমি কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, সেই মুহূর্ত্তেই নিঃশব্দে অপরিবর্ত্তনীয় ভাগ্যদেবতা তার নির্দ্দিষ্ট পথে সরে গেল।

তখন রমজান মাসের (৭১) প্রারম্ভ, পরের দিন দারা শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে সামুগড়ের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, সেই রাত্রিতে ও প্রত্যূষে সৈন্যদের বহুলাংশ ক্রমাগত এসে পৌঁছাচ্ছিল। শ্বাসরোধকারী উষ্ণ বায়ু চারিদিক বিভ্রান্ত করছিল, বিরাট প্রান্তরে জলাভাবে সৈন্যগণ অস্থির। দারার অভিপ্রায় ছিল দামামা

(৭১) মুসলমানের নিকট রমজান মাস পবিত্র, এই মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ। এই মাসেই মহম্মদ আল্লাহ্র বাণী পেয়েছিলেন বলে দাবী করেন।

নিনাদে আক্রমণের আদেশ দিবেন, কারণ তখন আওরঙ্গজেবও তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তখনও বহু সৈন্য পরিশ্রান্ত, কিন্তু দারার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা বলল, "আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডল দারার ভাগ্যের প্রতিকূল, অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। দারার অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর তুলনায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল সমুদ্রে গোষ্পদ মাত্র……" তার পর দিন দারা সম্রাটের নিকট থেকে পত্র পেলেন যে, তাঁকে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করে সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দারা উত্তর দিলেন—আওরজেব ও মুরাদকে সম্রাটের নিকট তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

পরের দিন শনিবার শাহজাদা দারার অভিপ্রায়—আক্রমণ করা হউক। আবার বিশ্বাসঘাতকদল বলল—অশুভ সময়, কারণ মেঘ বর্ষণ-মুখর। তার পরের দিন রবিবার—এই দিনে, ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করেছিলেন—আবার অপেক্ষা করা হউক। এই তৃতীয় বার; পর পর তিনবার।

এবার নক্ষত্র তার লক্ষ্যে উপনীত……। শনিবার মধ্যরাত্রির দিকে আওরঙ্গজেব তিনবার কামান ধ্বনি করলেন, উদ্দেশ্য বিশ্বাস-ঘাতকদের জানিয়ে দেওয়া তিনি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত; বিরাট কামান শ্রেণী প্রস্তুত। সৈন্যদল ও পশুগুলি বিশ্রাম নিচ্ছিল। দারাও তিনবার কামান ধ্বনি করে প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষের পূর্ব্বে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয় নি।

দারার কামান অবিরাম গোলা বর্ষণ করছিল। বারুদের ধূম্রজালে আকাশের মেঘমণ্ডল ঘনকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেই আওরঙ্গজেব আমাদের গোলার বহু দূরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব সামান্য কয়েকবার গোলা নিক্ষেপ করলেন। তারপর আবার তিনটি কামান ধ্বনি অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দ্বিতীয়বার সঙ্কেত……।

খলিখুল্লা খান আর একবার উপদেশ দিল,—"যুবরাজ যখন শত্রু সৈন্যের বৃহৎ অংশ কামান দিয়ে ধ্বংস করেছেন ; এবার সময় হয়েছে, আপনি অগ্রসর হ'ন, আপনার বিজয় সম্পূর্ণ করুন।" দারার বিশ্বস্ত সেনাপতি রুস্তম খান বল্লেন—"শত্রুকে আক্রমণ করতে দেওয়া হউক। তখন যুবরাজের উপযুক্ত সৈন্য দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে। আমাদের সৈন্যবল বেশী এবং সুযোগ আমাদের দিকেই বেশী।"

কিন্তু খলিখুল্লা খানের পরামর্শ গ্রহণ করা হ'ল। রুস্তম খানকে ভীরু কাপুরুষ বলে নিন্দা করা হ'ল। বিজয়ের সম্মান যুবরাজের প্রাপ্য, হাঁ বিজয়ের সম্মান…আর অপেক্ষা করা অসমীচীন।

দারা গোলন্দাজ বাহিনীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত শত্রুকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। এই অকস্মাৎ অগ্রসর হওয়ার আদেশে অশিক্ষিত সৈন্যদল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। লৌহকার, কসাই, নরসুন্দর প্রভৃতি অশিক্ষিত সৈন্যদল শত্রুর পলায়নপর রসদ শিবিরে স্বর্ণ, রৌপ্যের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করল। শত্রুবধ না করে পরস্পর হত্যায় ব্যাপৃত হ'ল।

দারা কিন্তু বীরের মত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং হস্তদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যকে অগ্রসর হবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কামান ধ্বনি াান্ত হয়ে গেল, দামামার শব্দ পুনরায় আরম্ভ হ'ল। শত্রুর পক্ষ থেকে দু' ।কটি কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। হঠাৎ কামান গর্জ্জন এবং ়গালন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে দারার সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো। চবু দারা হস্ত উত্তোলন করে আদেশ দিতে লাগলেন।

ছত্রশাল এবং রুস্তম খান দারাকে রক্ষা করার জন্য আওরঙ্গজেবের

গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন এবং শত্রুর পদাতিক ও উষ্ট্রবাহিনীকে পলায়ন করতে বাধ্য করলেন।

আওরঙ্গজেব এই আসন্ন বিপদ ধারণা করতে পারেন নি। তিনি শেখ মীরের অধীনে আরও সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। এই শেখ মীরই তাঁকে মুক্তা খরিদ না করে সৈন্যসংগ্রহের উপদেশ দিয়েছিল। যুদ্ধ চলতে লাগল। শত্রুগণ পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। যুদ্ধ চলতে লাগল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, শিঙ্গার নিনাদ, তীরবর্ষণ ক্রমাগত চলল। রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে দারা হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে সৈন্যদের বীরোচিত কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। শত্রুদল প্রায় বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ল।

* * * *

আগ্রা সহরে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক লোক জেনে গেল যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বেলা শেষে একজন ফিরিঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো। তার অশ্ব নিজের গৃহের পার্শ্বে-ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এই ফিরিঙ্গী দারার রসদ শিবির লুণ্ঠন করেছিল। সে চারিদিকে প্রচার করে দিল যে, সম্রাটের সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তারপর আমার মনে হল যেন পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ মসীময় হয়ে এসেছে। নক্ষত্রের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিছুকাল পর সংবাদবাহক ছুটে এসে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলির একটি অসংলগ্ন বিবরণ দিয়ে গেল। সামুগড়ের যুদ্ধের চরম মুহূর্ত্তে এই লোকটি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছিল। তার আশা ছিল যে সে স্বয়ং সম্রাটকে শাহবুলন্দ ইক্‌বালের (৭২) জয়ের সংবাদ দেবে।

(৭২) "বুলন্দ্‌ ইকবাল" অর্থাৎ ভাগ্যবান দারার উপাধি। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস দারার মত দুর্ভাগ্য আর কে ছিল?

আমি কিন্তু কোন জনশ্রুতিতেই বিশ্বাস করিনি। গত কয়েক দিনের মধ্যে আমার পিতার বয়স কয়েক বৎসর বেড়ে গেছে। আমি আমার পিতাকে সান্ত্বনা বা উৎসাহ দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। আমি প্রাসাদ শিখরে উঠে দিনের আলোয় সমস্ত প্রান্তর নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তখন সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর। একটা অমঙ্গলের ছায়ার মত রাত্রির শীতল বাতাস নক্ষত্রের দিকে একটা কালো ঘন ধুলির মেঘ উড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি। কিন্তু সবই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি শুনলাম দলের পর দল অশ্বপদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেল। প্রাসাদের দিকে কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। কোন লোক এদিকে কেন আসে না?

রাত্রি গভীর হতে লাগল। এক প্রহর শেষ হয়ে গেছে। আমি শুনতে পেলাম—ঝঞ্ঝার প্রাক্কালে প্রভঞ্জনের মত এক অশ্ববাহিনী অগ্রসর হয়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ নিকটস্থ হ'লে আমি বুঝতে পারলাম অশ্বখুরের শব্দ কত অসংলগ্ন! এই সমস্ত অশ্ব কি আহত হয়েছিল? আলো নেই কেন; কিন্তু এইবার মনে হ'ল অনেক অশ্বারোহী দুর্গদ্বারে এসে থেমেছে।

দারা এসেছেন কিন্তু তিনি তোরণ অতিক্রম করেন নি। পরিশ্রান্ত ভাগ্যহত দারা দুর্গে প্রবেশ করেন নি। তাঁর ভয় ছিল যদি শত্রু এসে তাঁকে দুর্গে আবদ্ধ করে রাখে। দুর্গের মধ্যে পিতার কিংবা আমার সম্মুখে সেই অবস্থায় প্রবেশের সাহস তার ছিল না। কিন্তু নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করার পূর্ব্বে আমার কাছে একটি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

যখন দারার দূত এসেছিল আমি তখন পিতার কাছে উপস্থিত ছিলাম। শাহজাদা সম্ভাষণের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—"ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে।"

সম্রাট সৈন্যদলের পুরোভাগে উপস্থিত থাকতেন। দারার কি ভীষণ আক্ষেপ—উঃ! সম্রাট যদি একবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন. সৈন্যগণ বুঝত যে, সম্রাট জীবিত; তাহলে যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হত। আমরা সম্রাটের নিকট তাঁর বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলাম—সান্ত্বনার জন্য। আমি এক্ষণে জানলাম যুদ্ধের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি। আওরঙ্গজেবের সৈন্য যখন পলায়মান এবং যখন তাঁর নিজের বন্দী হওয়ার মতন অবস্থা তখন আওরঙ্গজেব তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বারোহীর দল দারার অগ্রগতি রুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। নিজের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল আত্মরক্ষার জন্য রেখেছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর হস্তীটিকে ভূমির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলেন, সুতরাং সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তীর উপর উপবিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর সৈন্য দলকে দেখেয়েছিলেন যে তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত নন এবং যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদি শাহজাদা দারা পূর্ব্বের মত পলায়মান শত্রু সৈন্যের অনুসরণ করতেন, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সেদিন আগ্রায় আনীত হ'ত। কিন্তু অসমতল ভূমির উপর দিয়ে দারার অগ্রগতি ব্যাহত হ'ল। বিশ্রামের জন্য একটু অপেক্ষা করলেন।

রক্তাক্ত ধূলিধূসরিত দূত আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান পরাজয়ের মত দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ সে তার বর্ণনা স্থগিত রাখল—যেন সে দুঃসংবাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময় দিচ্ছে। অবশ্য আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। তারপর আবার সেই সৈন্যাধ্যক্ষ বলতে লাগল, "যখন শাহজাদা বিশ্রাম করছিলেন, তখন সুলতান মহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধে রুস্তম খান নিহত হয়েছেন—আর রাও ছত্রশাল নজবৎ খানের সঙ্গে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে গেছে। সত্যই তো আমরা সেই কক্ষে বসে আছি এবং দারার সৈন্যাধ্যক্ষ তখনও কথা বলছিল। কিন্তু এর সবই যেন আমার কাছ থেকে বহুদূরে। আর কি হবে? সমস্তই তো শেষ হয়ে গেছে। আমরা তো মৃত্যুর রাজ্য পার হয়ে এসেছি।

আমার পিতা কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমি শুনলাম সেই দূত উত্তর দিচ্ছে, "যদি রুস্তম খান আর ছত্রশালের মৃত্যুর সংবাদ শুনে খলিলুল্লা খান শাহজাদা দারার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়ে আসতেন তবে এই যুদ্ধের পরিণাম অন্য রকম হ'ত।"

না, আমরা সকলে তখনও মরিনি। প্রতিশোধের জন্য নূতন করে বাঁচতে হবে * * * *

আমি আবার শুনতে লাগলাম—"রামসিং (৭৩) তাঁর রাজপুত যোদ্ধাদের সঙ্গে সসম্মানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তারপর দারা আবার মুরাদ বক্সের বিরুদ্ধে হিন্দু-সৈন্য পরিচালনা করলেন। কিন্তু তখন এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেল—দারা তাঁর হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি হল। সৈন্য এবং অধিনায়কগণ মনে করল যে দারা মৃত, সুতরাং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ জয়ের জন্য অগ্রসর না হয়ে বাত্যার সম্মুখে মেঘের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল……

ও! যে এই সংবাদ বহন করে এনেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তার মৃত্যু হ'ত! সে দেখে এসেছিল যে, খলিলুল্লা খান পাঁচ সহস্র সৈন্য নিয়ে শত্রুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়েছে—কিন্তু যুদ্ধ করবার জন্য নয়। আওরঙ্গজেব তখন হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন—যেন পৃথিবীর মধ্যে সেই একমাত্র স্থান যেখান থেকে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

আমি আর শুনতে পারলাম না। আমি পিতাকে পরিত্যাগ করে আমার প্রাসাদে চলে এলাম।

একটা নৃশংস হস্ত আমার হৃদপিণ্ডকে এমন কঠিনভাবে পেষণ করেছিল যে, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমি যমুনার সম্মুখে স্তম্ভপার্শ্বে দরজার নিকটে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় কোয়েল

(৭৩) রামসিংহ জয়সিংহের পুত্র।

উপস্থিত হ'ল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সে বল্ল যে, বুন্দীরাজ্যের একজন অশ্বারোহী সৈন্য বেগমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। সে তার বার্ত্তা অন্য কোন লোককে জানাবে না। কোয়েল একবার এই অশ্বারোহীকে ফতেপুরে দেখেছিল।

আমি আমার কক্ষের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে বল্লাম; আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় ভরে উঠল।

অশ্বারোহী সৈন্য অন্ধকারে অগ্রসর হচ্ছিল। তার ঘন উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করতে পারছিলাম। ক্ষত স্থানগুলি রক্ত-উৎসারিত। নতজানু হয়ে সে উপবেশন করল। আমি তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিলাম—যেন সে আমার প্রিয় কোন বন্ধু। তারপর আমি দেখলাম তার হস্তে রয়েছে একটি মুক্তাহার শুভ্র, স্বল্প রক্তাভ। অনেকক্ষণ পরে সে কথা বলেছিল। কি করে আমি সেই শব্দের প্রতিধ্বনি করব? সে যেন মূর্চ্ছাবেগে অসংলগ্ন কথা বলেছিল। কিন্তু আমি সে শব্দগুলির সারাংশ লিখছি :—

"যখন দারার সহস্র সহস্র ভয়ার্ত্ত সৈন্য শত্রুর অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে পলায়মান বুন্দীরাজ তাঁর উৎকৃষ্ট সৈন্য দল নিয়ে নজবৎ খানের অশ্বারোহীকে আক্রমণ করে মুরাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তারপর নিজের অনুচরদিগের দিকে ফিরে উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন, 'পলাতকের জীবন অভিশপ্ত। আমার ক্ষাত্র ধর্ম্মশাসন অনুসারে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত। আমি জয় লাভ ভিন্ন এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে পারি না।' তারপর তিনি তাঁর সৈন্যদের উৎসাহিত করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হলেন। কামানের গোলা তাঁর হস্তীকে আহত করল, হস্তী পলায়ন করল। ছত্রশাল হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে অশ্বের জন্য আহ্বান করে বল্লেন, 'আমার হস্তী শত্রুর পশ্চাৎমুখ। কিন্তু হস্তীর অধীশ্বর কখনও পশ্চাৎপদ্ হবে না।' তাঁর সৈন্যগণকে ব্যূহ ভেদ করে, তিনি

মুরাদকে লক্ষ্য করে বর্শা উত্তোলন করলেন। এমন সময় একটি গুলি তাঁর ললাট বিদ্ধ করল।"

আমি নীরবে বসেছিলাম। নীরব, নিস্পন্দ, তার একটি শব্দও হারাতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভয় হ'ল, যদি রক্তক্ষয়ে এই মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ত' আর ছত্রশালের কাহিনী শুনতে পাব না। তার শীর্ণ মুখমণ্ডল থেকে চক্ষুর উজ্জ্বল দীপ্তি তখনও নিষ্প্রভ হয় নি। আমি শুনলাম, "বুন্দ রাজ্যের কনিষ্ঠ পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে শত্রুকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে মৃত্যু বরণ করেছিল। এইভাবে উজ্জয়িনী ও ঢোলপুরে দ্বাদশ রাজকুমার সম্রাটের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন···"

এইবার আওরঙ্গজেব শাহজাদা দারার পরিত্যক্ত কুম্‌কুম্ বর্ণ শিবির অতিক্রম করতে পারলেন। কুম্‌কুম্ রাও—কুম্‌কুম্—কুম্‌কুম্—রক্ত, রক্ত, রক্ত * * * * *

সেই লোকটি মুক্তাহারাটি নিয়ে তার উষ্ণীষের অঞ্চল দিয়ে রক্তকণা মুছে দিল। তারপর বল্ল. "একটি বন্দুকের পশ্চাৎ ভাগ দিয়ে আমায় কে যেন আঘাত করল। আমি মৃতের মতন সমরক্ষেত্রে পড়েছিলাম। যখন শত্রু চলে গের, আমি আমার প্রভুর দিকে অগ্রসর হলাম।

"আমার প্রভুকে তখনও তারা দেখেনি। তার পবিত্র দেহ ঢোলপুর নদীতীরে দাহ করবার জন্য নিয়ে গেছে। আমি তাঁর মুক্তাহার দেখে ভাবলাম—বোধহয় সম্রাটনন্দিনী তাঁর পিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসী সামন্তের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে এই মুক্তাহার গ্রহণ করবেন।"

আমি আমার উভয় হস্ত প্রসারিত করে সেই পবিত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করলাম। আমার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সেই দান আমার বক্ষে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কার আঘাতে তোমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে?" সে চারিদিকে দেখল, অন্য কোন লোক সেই কক্ষে আছে কিনা—তারপর মৃদুকণ্ঠে বল্ল—

"সম্ভবতঃ সুনিশ্চিত ভাবে এই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকের ধারণা মুরাদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার পাশ দিয়ে গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল—আমার বিশ্বাস নজবৎ খানের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

তারপর সে আমার খুব নিকটে এসে বল্ল—"বাদশাহ বেগম, বোধহয় কাল আমি আর পৃথিবীতে থাকব না। আপনাকে একটা গোপন কথা বলে যাব। যখন আওরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করছিলাম, প্রভু একদিন আমাকে একটা সংবাদ নিয়ে আওরঙ্গজেবের শিবিরে প্রেরণ করেন। প্রহরী আমাকে অপেক্ষা করতে বল্ল—আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, আওরঙ্গজেব এবং নজবৎ খান আলোচনা করছেন। * * *

আমি বুঝতে পারিনি নজবৎ খানের কথার অর্থ। নজবৎ খান বলেছিলেন, 'বাদশাহের অভিপ্রায় নয় যে তাঁর কন্যা জাহানারাকে তিনি বল্কের রাজবংশের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, কিন্তু তিনি বুন্দীরাজের পৌত্তলিক মন্দিরের পূজারিণী স্বীকৃত হবে কি?' আওরঙ্গজেব উত্তর দিলেন, 'এই কাজ করতে হলে ধর্ম্মদ্রোহী ইসলাম বিরুদ্ধাচারীকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করতে হবে। অবশ্য আল্লাহ্ এই অনাচার নিবারণ করেন।' আমি আমার প্রভুকে এই আলোচনার কথা বলেছিলাম। আমি এর পর থেকে লক্ষ্য করেছিলাম যে নজবৎ খানের সঙ্গে মহারাজার সাক্ষাৎ হলে তাঁরা পরস্পরকে সাদর-সম্ভাষণ বিনিময় করেন নি।

আজ নূতন করে ছত্রশালকে আমার অত্যন্ত আপনার বলে মনে হ'ল, যেমন মনে হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাজমহলের পার্শ্বে। আমি অনুভব করলাম, রাণা ছত্রশাল আমাকে কখনো ত্যাগ করবেন না, করতে পারেন না।

আমি সেই আহত সৈন্যকে সেইদিন দুর্গে অবস্থান করবার জন্য অনুরোধ করলাম, এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তার ক্ষতস্থান

সুচিকিৎসিত হবে। প্রভুভক্ত সৈনিক উত্তর দিল, "এবার আমি আমার প্রভুকে অনুসরণ করব।" তারপর সে প্রত্যাবর্ত্তন করল—অধরে তার আশীর্ব্বাদের সস্মিত হাস্যরেখা। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে সে আবেগ কণ্ঠে বলে উঠল—"বেগমসাহেবা, আমি আজ ভবিষ্যৎ বাণী করে যাচ্ছি, এই শেষবার; আর কখনো রাজস্থানের সন্তান মুঘল পতাকাতলে সমবেতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবে না।"

এই সৈন্যটি অন্তর্দ্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই কোয়েল আমাকে সংবাদ দিল—"খলিলুল্লা খানের পত্নী দ্বারদেশে পাল্কীতে অপেক্ষা করছেন।" ভগবান জানেন, এই নারীর শাস্তি কে দেবে? এই নারীর উপস্থিতি মোগল সম্রাটের ও সাম্রাজ্যের কি ভীষণ সর্ব্বনাশ করেছে? তবু আমি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালাম। সে অনেকক্ষণ বিলাপ করল। তার স্বামী শীঘ্রই বিজেতা আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। কিন্তু সে সম্রাট এবং সম্রাট দুহিতার মতই পরাজয়ের জন্য শোক অনুভব করছে। তারপর সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "বোধ হয় খলিলুল্লা খানের পরামর্শেই শাহজাদা দারা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং সেই জন্যই সৈন্য দলের মধ্যে বিভ্রান্তি এসেছিল। খলিলুল্লা খান বলেছিলেন, আওরঙ্গজেবকে নজবৎ খানের সৈন্যসমেত বন্দী করা সহজ হবে,—এই ধারণা দিয়ে তার স্বামী শাহজাদা দারাকে প্রতারিত করেছিল। দারা তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবার পূর্ব্বেই খলিলুল্লা খান শত্রুর শিবিরে যোগ দিয়েছিল।"

আমি একাকিনী যমুনার পাশে বারান্দায় এলাম। আমি একটি স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল হয়ত এই স্তম্ভই আমার জীবনের শেষ অবলম্বন। তখনও সেই অদৃশ্য কঠিন হস্ত আমার হৃদপিণ্ড পেষণ করেছিল—অবশ্য এখানে একটু সহজ নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

দুঃখে, ঘৃণায়, প্রতিশোধের স্পৃহায় আমার রক্ত ঘনীভূত হয়ে যাচ্ছিল। আমার ব্যথার ভার অসহ্য মনে হ'ল, তারপর আমি হঠাৎ একটা ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলাম। আমার এই স্থূলদেহ যেন সূক্ষ্ম-দেহে পরিণত হ'ল, আমি অনুভব করলাম যেন আমি পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আমার দেহ যেন বায়ু, জল, অগ্নিতে পরিণত হ'ল, আমি যেন রক্ত মাংসের শরীর থেকে বিমুক্ত হয়ে গেলাম। আমার পদনিম্নে নদীজলধারা বয়ে চলেছে। যমুনার কলধ্বনি অতি শান্ত, মৃদু গতিতে আমার কর্ণে প্রবেশ করছে—আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করছে সেই কলধ্বনি। ক্রমশঃ সেই কলতান এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পরিণত হ'ল, যেমন আমি দিল্লীর নহবৎখানায় শুনেছিলাম—একটিমাত্র মানুষের বাক্যধ্বনি আর বহু মানবের ক্রন্দন। যমুনা আমাকে বয়ে নিয়ে চলেছে দূরে—বহু দূরে, এই জীবন নদীর তীর থেকে আরও দূরে। সেই যমুনার জলধারা পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও লজ্জা নির্ম্মল করে দিয়েছে। আমার অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দেখলাম—সমস্ত জগৎ আলোকময়। আমি আর ইহজগতে নেই। আমি আজ বহু দূরে বসে আছি; আমার স্বয়ম্বর সভা বসেছে।

আমি আমার জীবন কাহিনী আমাকে বলতে চেয়েছিলাম। সে কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার দুঃখ তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

আমাকে যেন কেউ বাধ্য করে লেখাচ্ছে। আমি যেন আমাকে ছাড়াও অন্য কারো সম্মুখে, এই কাহিনী বলে যাচ্ছি।

বিস্মৃতিকেই উৎসর্গ করে যাব আমার কাহিনী। সে বিস্মৃতিই হয়ে থাকবে স্মৃতির বাহন। সামুগড়ের যুদ্ধের পরের দিন রাত্রে কোয়েল আমাকে দেখতে পেয়েছিল বারান্দায় একটি স্তম্ভের পাশে বাহু নিবদ্ধ গভীর সুপ্তিমগ্ন। সে আমাকে জাগ্রত না করে আমার চারিদিকে একটি আস্তরণ

ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যুষে আমি নিদ্রাভঙ্গের পরে অনুভব করলাম যেন আমার সমস্ত শরীর রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমি রাত্রি তৃতীয় যামে অনুভব করেছিলাম এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। সেই অনুভূতি আমাকে আজও সকল দুঃখ সহনে সামর্থ্য দিয়েছে।

আজকে আমার মনে হচ্ছে যেন ভারতের চাঘ্‌তাই বংশ প্রেতের সমষ্টি মাত্র—তারা পৃথিবীতে এসেছে প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সেই ফকিরই তো বলেছিলেন যে, আওরঙ্গজেব তৈমুর বংশ ধ্বংস করবার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছেন এবং এই যুদ্ধের পরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

দারার সৈন্যদল পলায়ন করেছে। খলিলুল্লা খান মানুষ ও পশুর মৃত-দেহের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করে আওরঙ্গজেবের শিবিরের দিকে চলেছে। বিজয় ঘোষণা করে দামামার ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করা হ'ল। খলিলুল্লা খান ও মুরাদের যৌথবাহিনী আওরঙ্গজেবকে বেষ্টন করে আওরঙ্গজেবকে অভিবাদন করল। আওরঙ্গজেব মুরাদকে অভ্যর্থনা করলেন—যেন মুরাদ ভারতের অধীশ্বর। তারপর দুই রাজভ্রাতা দারা শুকোর পরিত্যক্ত শিবিরে উপস্থিত হলেন। আওরঙ্গজেব মুরাদকে বশ্যতা স্বীকারের সমস্ত আনুষঙ্গিক রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী অভ্যর্থনা করলেন এবং বল্লেন, "আজ তোমার রাজত্বের প্রথম দিন।" মুরাদ এই সমস্তই বিশ্বাস করেছিলেন। আওরঙ্গজেব কি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেন নি যে, মুরাদকে তিনি সিংহাসনে বসাবেন? কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানত, যথাসময়ে আওরঙ্গজেব দরবেশের আলখাল্লা পরিত্যাগ করে সম্রাটের পরিচ্ছদ গ্রহণ করবেন। আওরঙ্গজেব তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন।

এই ব্যাপারে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানের নিকটও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি সম্রাটকে যথেষ্ট ঘৃণা করতেন, তিনিই ছিলেন

সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর। আওরঙ্গজেব এবং শায়েস্তা খান সমস্ত রাজ-প্রতিনিধি এবং শাসনকর্ত্তাদের কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে দারাকে অনুসরণ করার জন্য আদেশ দিলেন। দারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দিল্লীর পথে পলায়ন করেছিলেন। সুলেমান শুকোর সৈন্যাধ্যক্ষকে পত্রে লেখা হয়েছিল যেন তারা সুলেমান শুকোকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে।

যুদ্ধের কয়েকদিন পরে সম্রাটের বিশ্বাসঘাতক সেনানিগণ আগ্রার অদূরে এক বিখ্যাত উদ্যানে সমবেত হয়েছিল। সেই স্থান থেকে আওরঙ্গজেব সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব ভাণ করে লিখলেন, আমি আপনার বশংবদ পুত্র। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য দারা শুকোর ষড়যন্ত্র থেকে আমার পিতাকে মুক্ত করা।" সম্রাট সেই সুরেই উত্তর দিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আওরঙ্গজেবকে প্রতারণা করবেন। আমরা যে সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছি, সেস্থান থেকে উদ্ধার পাওয়া কি সম্ভব? মিষ্টবাক্যে আওরঙ্গজেব সমস্ত সেনানায়ক ও আমীরদের তাঁর দলভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আপামর প্রজাবর্গ নেতৃ-বিহনে আমাদের কি করে সাহায্য করবে? আমরা কেবল চিন্তাই করলাম, কেবল চিন্তা; কখনো······

তারপর আমার পিতা আওরঙ্গজেবকে সাক্ষাৎ করার জন্য একখানি পত্র লিখলেন। কারণ তাঁর চিঠিতে ছিল যে, আওরঙ্গজেব সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চান এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান। কে জানত সম্রাটের কি উদ্দেশ্য? আওরঙ্গজেব জানতেন সম্রাট দেহরক্ষী তাতার নারীবাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। বোধ হয় সেই বাহিনীকে হস্তগত করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আওরঙ্গজেব পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন নি। কিন্তু প্রত্যেকদিন আওরঙ্গজেব রটনা করে দিতেন যে তিনি আসবেন। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত

হচ্ছিলেন। তারপর সহসা একদিন আওরঙ্গজেব তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাজমহলের অপর পার্শ্বে শিবির স্থাপন করলেন। নগরের সমস্ত বিশ্বাসঘাতক আমিন খানের পরিচালনায় আওরঙ্গজেবকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য উপস্থিত হ'ল, মুখে সুমিষ্ট অভিনন্দন, হস্তে মূল্যবান উপঢৌকন!

একজন মাত্র বিশ্বাসী আমীর সঙ্গে নিযে আমার পিতা সমস্ত দুর্গ পরীক্ষা করে কামানে অগ্নিসংযোগের আদেশ দিলেন, কারণ আওরঙ্গজেবের সৈন্য নগরের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেবই সমস্ত সহর অধিকার করে দারা শুকোর শূন্য আবাসে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সমস্ত গোলন্দাজ বাহিনী'কে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা হ'ল; তীরের ফলকে সংযুক্ত একখানি পত্র প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হ'ল···। ফলে সৈন্যের পর সৈন্য রজ্জুর সাহায্যে প্রাচীর গাত্রে অবতরণ করে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। সমস্ত দুর্গ আওরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার করল। আমরা দুর্গের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদের বিনানুমতিতে কোন খাদ্যদ্রব্যই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত না। ক্ষুধা তৃষ্ণাপীড়িত প্রহরী আর আমাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ল। পরিশেষে সম্রাট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সুলতান মহম্মদের হস্তে ছিল সমস্ত দুর্গের চাবি; আমি আজও দেখতে পাচ্ছি খোজা ভৃত্যগণ বিরাট চাবির গুচ্ছ নিয়ে দিল্লী তোরণের দিকে চলেছে; আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি বড় বড় চাবির গুচ্ছগুলির পরস্পর আঘাতে ঝনঝন শব্দ। সেই শব্দ বহুদূর আগত ঘণ্টাধ্বনির মত মানুষকে বিচারের জন্য আহ্বান করছিল······।

পুনরায় আমার পিতা আওরঙ্গজেবকে সাক্ষাৎ করবার জন্য আহ্বান করলেন। আওরঙ্গজেব সম্রাটকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে সেই পত্রের উত্তর দিলেন। পিতার কারাগার পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের

অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিয়ে রোশন আরাকে ও আমাকে আওরঙ্গজেব পত্র লিখলেন। আমি উত্তরে লিখেছিলাম, "আমি সম্রাটের পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তবু সম্রাটের রাজ্যের দুষ্টগ্রহ প্রতারকের গৌরবের অংশভাগিনী হব না। কিন্তু আমার ভগ্নী দুর্গ থেকে সাড়ম্বরে আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। আজ রোশনআরার বিজয়ের দিন। আজকে আমার মনে পড়ল একদিন সে শায়েস্তা খান এবং আমিন খানকে মুক্ত করবার জন্য দারা শুকোকে অনুরোধ করেছিল।

আওরঙ্গজেবের শক্তি অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করছিলেন। রাজ্যের অভিজাতবর্গের আনুগত্য-লাভের উদ্দেশ্যে তিনি অমাত্যদের দ্বারা সম্রাট কর্ত্তৃক লিখিত জাল পত্র রাজদরবারে পাঠ করতে লাগলেন। এই প্রতারণা খুব সফল হয়েছিল। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল—তিনি সকলকে বলতেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য সম্রাটকে ধর্ম্মদ্রোহী দারার কবল থেকে মুক্ত করা।

একদিন যা' মানুষকে ভীত ও আশ্চর্য্য করে দিত, আজ তাকে অদৃষ্টের বিধান বলে মনে হয়। আমি কি জানতাম না যে, আওরঙ্গজেব ব্যাঘ্রের মত তার শিকারের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত? আজকেই ব্যাঘ্র শিকার কবলের মধ্যে পেয়েছে। ভাগ্য তারকা তার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। যা' একদিন ছিল, আজ আর তা' নেই। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজ শান্তি বিরাজমান। যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন —"রাজাদের মাথার মুকুট খসে পড়েছে, আমরা হতভাগ্য যে আমরা এইরূপ পাপ করেছি, প্রভু! আমাদের তোমার কাছে নিয়ে যাও, প্রভু, তোমার কাছে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতে দাও, আমাদের দিনগুলি নবীন করে দাও; যেন আবার আমরা অতীতের মত নিষ্পাপ হ'তে পারি।"

আমরা কি আবার পূর্ব্বের মত নিষ্পাপ হতে পারব? আমার সত্তা বহুদূরে চলে গেছে। যদি আমার মধ্যে কোন অগ্নি বিদ্যমান থাকে তবে তা' আমার বৃদ্ধ পিতা এবং ভাগ্যহীন ভ্রাতা দারার জন্য নিয়োজিত হউক। তাদের জন্যই আমি জীবন ধারণ করব। আমি কুরাম দেবীকে স্মরণ করলাম—তিনি অন্তরের তীব্র বেদনার প্রলেপ স্বরূপে এসে চিন্তাগ্নি শিখাকে অভিনন্দন করেছিলেন……।

আগ্রার সমস্ত ব্যবস্থা যথাভিলাষ শেষ করে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে আগ্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করলেন। তারপর রাজকোষ থেকে যথাপ্রয়োজন অর্থ সংগ্রহ করে মুরাদের সঙ্গে দারার বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্য দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেন; দারা তখন লাহোরে একদল সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন।

কিন্তু পথে আওরঙ্গজেবের একটু কাজ অবশিষ্ট ছিল—তখনও মুরাদের রাজ্যাভিষেক হয়নি। মুরাদকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—আওরঙ্গজেব একাকী দারাকে অনুসরণ করুক। তিনি নিজে তাঁর বিশাল বাহিনী দিয়ে দিল্লী আগ্রা অবরোধ করে থাকুন। মুরাদ সর্ব্বদা নিজের দুর্ব্বার সাহসের গর্ব্বে স্ফীত ছিলেন, তাই ভীত হলেন না। তার উপর আওরঙ্গজেব কি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করে নি যে * * *

মথুরার পাশে সৈন্যদল বিশ্রাম করল। সেই অভিযানের পরবর্ত্তী দিনগুলি মুরাদের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল। মিষ্টতম ফল, সুন্দরতম ফুল, তীব্রতম সুরা নিরন্তর মুরাদের তৃপ্তি সাধন করছিল। মুরাদ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, আওরঙ্গজেবের শিবিরে রাজ্যাভিষেক ভিন্ন আর কোন আলোচনাই হয় না। প্রত্যেকটি হস্তী ও অশ্বের জন্য নূতন ঝালর তৈরী হচ্ছে, নূতন শিবির নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। উৎসবের নব

পরিচ্ছদ, নূতন অলঙ্কার—আরও কত কি? রন্ধনশালায় খুব ব্যস্ততা, সুমিষ্ট খাদ্য তৈরী হচ্ছে, সুগন্ধ ফুল নিষ্কাষণ চলেছে, নর্ত্তকী ও গায়িকা তাদের শিবিরে দিনরাত্রি নূতন নৃত্য গীতের পূর্ব্বাভিনয় করছে।

কিন্তু মুরাদের শিবিরে চলেছিল মদ্যপান আর উচ্ছৃঙ্খলতা। মুরাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল খোজা শাহবাজ। সে তার প্রভুর জ্ঞান-চক্ষুরুন্মেলন কর্ত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আওরঙ্গজেব নদীতীরে অতি মনোহর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। অবশেষে জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অভিষেকের শুভদিন উপস্থিত হ'ল। মুরাদ অশ্বারোহণে আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ইব্রাহিম খান একদা সামুগড়ে শাহজাদা দারাকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আবার মুরাদের অশ্ববল্গা ধরে মুখ ফিরিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন, মুরাদ সেই ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন। কিন্তু দাম্ভিক মুরাদ অগ্রসর হলেন।

ইব্রাহিম বলেছিলেন—সম্রাটের পথ চলেছে কারাগারের দিকে। শাহবাজ আল্লাহ্‌র নাম করে মুরাদকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেছিল। শিবিরের দরজায় পর্য্যন্ত অনেকেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সকল বাধা সত্ত্বেও মুরাদ শিবিরে প্রবেশ করলেন।

শেখ মীর, আমিন খান এবং আওরঙ্গজেবের কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর উৎসবের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সহাস্যে মুরাদকে অভিনন্দিত করল। আওরঙ্গজেব মুরাদকে অভিনন্দিত করলেন এবং ভ্রাতৃস্নেহের, ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বললেন, তারপর মুরাদকে সিংহাসনে নিয়ে গেলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হল—নর্ত্তকীকুল সমাগতা, বিকীর্ণ পুষ্পদাম, বিচ্ছুরিত গন্ধবারি প্রজ্বলিত ধূপ গুগ্‌গুল,—সমস্ত বায়ুমণ্ডল তীব্র মদির গন্ধে আমোদিত।

মুরাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত

হয়েছিলেন, মুরাদের সৈন্যদল আমোদপ্রমোদের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

উৎসবের ভোজ আরম্ভ হ'ল—সুস্বাদু খাদ্য ও সুপেয় সুরা। আওরঙ্গজেবের শিবিরে কোন সম্মানিত অতিথির পানপাত্র কখনো শূন্য হয় নি। দু'ঘণ্টা পরে আওরঙ্গজেব মুরাদকে বল্লেন—ভ্রাতা, তুমি বিশ্রাম কর। আমি অভিষেকের সমস্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা করব; আমি তোমাকে যথাসময়ে খবর দেব।

বিশ্বস্ত শাহবাজের সঙ্গে মুরাদ অন্য কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরী নারী অপেক্ষা করছিল—খোজা ভৃত্য তাকে দূর করে দিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর মুরাদ খুব শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন।

এই সমস্ত ও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি একজন বিশ্বস্ত লোক আমার কাছে বিবৃত করেছিল। আমি সেই কাহিনী শুনে শোকে নিষ্পেষিত হয়ে পড়েছিলাম—সমস্ত রাত্রি জেগেছিলাম—আর প্রার্থনা করেছিলাম। * * * ইয়া আল্লাহ!!!! * * *

শাহবাজ মুরাদের পদতলে বসে অতি মৃদুভাবে—তাঁর পদসেবা করছিল। হঠাৎ আওরঙ্গজেব উন্মুক্ত দরজার প্রান্তে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধানে শ্বেত পরিচ্ছদ, মস্তক শিরোপা-বিহীন; অভিষেকের অনুরূপ কোন ভূষণ তাঁর অঙ্গে ছিল না। মৃদুগতিতে আওরঙ্গজেব অগ্রসর হলেন।

তারপর মস্তক উত্তোলন করে খোজাকে উঠে আসতে ইঙ্গিত করলেন। খোজা আদেশ প্রতিপালন করল। তৎক্ষণাৎ চারজন লোক সেই খোজাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করল এবং সেই স্থানেই তাকে ভূনিম্নে প্রোথিত করা হ'ল।

এবার আওরঙ্গজেবের রাজভূমিকা আরম্ভ হ'ল। তিনি তাঁর চার

বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র আজীমকে ডেকে একটি উজ্জ্বল মুক্তা দেখিয়ে বল্লেন—"যদি তোমার ঘুমন্ত চাচার পাশ থেকে তাঁর তরবারি তাঁকে না জানিয়ে নিয়ে আসতে পার, তবে তোমাকে এই মুক্তাখণ্ড উপহার দেব।" এই ব্যাপারে যদি মুরাদ জেগে ওঠেন তবে মুরাদ দেখবেন, একটি নির্দোষ শিশু তরবারি নিয়ে খেলা করছে। শিশু আজীম উল্লসিত হয়ে মুরাদের তরবারি নিয়ে এলো। তখন স্বপ্নের আবেশে মুরাদের মুখে অপূর্ব্ব প্রশান্তি। আর একটি মুক্তা শিশুকে দেখিয়ে আওরঙ্গজেব বল্লেন—"তুমি চাচার ঐ ক্ষুদ্র ছুরিকা নিয়ে আসতে পার?" উল্লসিত শিশু আবার মুরাদের প্রতিবন্ধের ছুরিকা নিয়ে এল। আওরঙ্গজেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মুরাদ জেগে দেখলেন, তাঁর পদদ্বয় গুরুভার শৃঙ্খলাবদ্ধ। হস্তপ্রসারিত করে মুরাদ তাঁর অস্ত্রের সন্ধান করে দেখলেন। তিনি প্রতিশোধের কোন চেষ্টাই করেন নি। অবনত মস্তকে শান্তস্বরে মুরাদ বললেন—"কোরাণ স্পর্শ করে আমার কাছে এই শপথই করা হয়েছিল। আল্লাহ্!"

সঙ্গীত নূতন সুরে বেজে উঠল। মুরাদের অনুচরবর্গ মনে করল, অভিষেক উৎসব তখনও চলেছে। সন্ধ্যাসমাগমে দুটি হস্তী চলেছে—একটি আগ্রার দিকে, অন্যটি দিল্লীর পথে—দুটি হস্তীই প্রহরীবেষ্টিত। দিল্লীর পথে হস্তীপৃষ্ঠে চলেছে দুর্ভাগ্য মুরাদ।

ক্রমশঃ মুরাদের অনুচরবর্গ চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল—যেন তখন মুরাদের সেনাপতিগণ শিবির ত্যাগ করতে না পারে। তারা জানত আওরঙ্গজেবের কৌশল। * * *

রাত্রিতে হঠাৎ আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল আনন্দধ্বনি করে উঠল "জালা জালালুল্লাহ্" (সম্রাট আওরঙ্গজেব দীর্ঘজীবী হউন)। সঙ্গে সঙ্গে

ঘোষণা করা হ'ল যে, শাহজাহান এবং মুরাদের অধীন সৈন্যগণ দ্বিগুণ বেতন পাবে। মুরাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সৈন্যদল ভীষণ ভীতও হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল মুরাদের সমস্ত সৈন্য আওরঙ্গজেবের দলে যোগ দিয়েছে।

আওরঙ্গজেবের দরবেশের আলখাল্লার নীচে তাঁর শিরায় চেঙ্গিসের রক্তধারা প্রবাহিত হ'ত। চেঙ্গিস সমস্ত পৃথিবীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে-ছিলেন। শক্তি সংগ্রহের আকুলতায় যখন আওরঙ্গজেবের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠত, রক্তধারায় মুছে যেত কোরাণের অক্ষরগুলি।

মুরাদ চলেছেন দিল্লীর রাজপথে, অত্যন্ত অপমানিতভাবে। তাঁর পশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে অনুসরণ করে চলেছে ঘাতক—পলায়নের চেষ্টা মাত্রই মুরাদের শিরশ্ছেদ করবে। বন্দী অবস্থায় তাঁকে কারাগারে নিয়ে গেল, সেখানে তাঁকে পান করতে হ'ল "পপীর" সরবৎ।

তারপর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

কতকগুলি পত্র ছিন্ন, অসংলগ্ন···পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নি

আমি দারার ইতিহাস লিখছি—আমার কপোল আমি পত্রের উপর ন্যস্ত করলাম, আমার অশ্রুধারা কালির অক্ষরের সঙ্গে মিশে যাক।

মাঝে মাঝে দারার ইচ্ছাশক্তি দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠত। সেই শক্তির আবেগে দারা লাহোরে প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমাবেশ করলেন—লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তী একজন রাজা দারাকে সৈন্য সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দারা তার কথার উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর করলেন। আমার সহোদরদের মধ্যে দারার মতন হৃদয় জয়ের ক্ষমতা আর কারো ছিল না। তাঁর ছিল মুখে সরল হাসি, কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর। দারা এই হিন্দুরাজার হৃদয় জয় করার বাসনা করলেন। তাকে রাজানুগ্রহের বহু নিদর্শন এবং যথেষ্ট অর্থ উপহার দেওয়া হ'ল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের গুপ্ত পত্রাবলী রাজ্যের প্রতি কোণে ছড়িয়ে গেল।

হিন্দু রাজা দারাকে পরিত্যাগ করল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রেরিত অর্থ ত্যাগ করতে পারল না।

আওরঙ্গজেব সৈন্যদের পুরোভাগে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে, বহু বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ দারার পক্ষপাতী। তাদের অনেকেই দারার সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তন্মধ্যে দায়ুদ খান অন্যতম। আওরঙ্গজেব অনেকগুলি জাল পত্র তৈরী করলেন—পত্রের মূল কথা আওরঙ্গজেব ও দায়ুদ খানের পত্র বিনিময়। সেই পত্রগুলিতে দারার চিত্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। হতভাগ্য দারা তাঁর বিশ্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। দারা দায়ুদখানকে আদেশ করলেন, "আমাকে ত্যাগ কর। আমার সৈন্য পরিত্যাগ করে চলে যাও।" দায়ুদখান শিশুর মতন ক্রন্দন করলেন। তার পর দায়ুদখান উত্তর দিলেন—"দুর্ভাগ্য দারাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে।" দায়ুদখান দারাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

অতি দ্রুতগতিতে দারা লাহোর ত্যাগ করে স্থানান্তরে আশ্র

অন্বেষণ করলেন। ভাক্কারের (৭৪) দুর্গে তাঁর বহু সুশিক্ষিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে গেলেন—অবশ্য তাঁর অনেক সৈন্য তাঁকে পরিত্যাগ করে গেছে। পরিশেষে দারা গুজরাটে উপস্থিত হলেন ;—সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করলেন।

ইত্যবসরে আওরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন শাহ্ শুজা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে বহু সৈন্য নিয়ে অভিযান করেছেন। শুজা দারার অনুসরণ ত্যাগ করে তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করলেন। তাঁর লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য আওরঙ্গজেব দ্রুত অশ্বচালনা করে অনেকবার সৈন্যদের অতিক্রম করে একাকী বহুদূরে চলে যেতেন, কখনও একাকী বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতেন। কখনও নিজের ঢালের উপর মস্তক ন্যস্ত করে নিদ্রা যেতেন।

অতর্কিতে আওরঙ্গজেব একদিন বনপথে রাজা জয়সিংহের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। জয়সিংহ সুলেমান শুকোর সৈন্য পরিচালক। তিনি দারাকে ঘৃণা করতেন—কারণ, তাঁকে একদিন "গায়ক" বলে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু জয়সিংহ শাহজাহানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। জয়সিংহের সৈন্যগণ আওরঙ্গজেবকে হত্যা করে সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত করবার জন্য অনুরোধ করল। যদি তাহা করা হ'ত জয়সিংহের প্রশংসায় পৃথিবী মুখর হয়ে উঠত !

আওরঙ্গজেব বিপদের গভীরতা অনুভব করলেন। তিনি একাকী জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে উপস্থিত হ'লেন—যেন তাঁর প্রত্যাশাই আওরঙ্গজেব করেছিলেন। তৈমুরের ভাষায় রাজা জয়সিংহকে প্রশংসা করলেন। তারপর নিজের কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলে রাজার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আমি আপনাকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা

(৭৪) ভাক্কার—পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য

নিযুক্ত করলাম···সাম্রাজ্যের প্রয়োজন—আপনি এই মুহূর্তে দিল্লীর পথে যাত্রা করুন।”

ভাগ্য নিজের পথ রচনার জন্য কতকগুলি অস্ত্র ব্যবহার করে—সে অস্ত্র সৎ হউক আর অসৎ হউক। কিন্তু ভাগ্য আমাদের পথের গতি কোন্ দিকে রচনা করেছেন?

রাজা জয়সিংহ অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করলেন।

আগ্রার তীব্র উত্তাপ কণ্ঠরোধ করে দেয়। প্রায়ই আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি—আমার মনে হ'ত যেন আমার স্বর্ণ শয্যার উপরিভাগে কক্ষের ছাদ আমার শবাধারের আবরণে পরিণত হয়েছে। আমার পিতা ও আমি যেন সমুদ্রে জলমগ্ন যাত্রী—এক নির্জ্জন দ্বীপে উঠেছি। আমাদের কাছে আগত সংবাদগুলি যেন একটি বিরাট নৌবাহিনীর বাত্যাবিক্ষুব্ধ ধ্বংসীভূত যানের ভগ্ন অংশমাত্র। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ঘৃণা যেন আমার পিতার দেহে নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চার করেছিল।

অদূরে খাজুয়ার প্রান্তরে নবীন সম্রাট ও শাহ্ শুজার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কি ভীষণ সংগ্রাম! আওরঙ্গজেবের হস্তীর চতুর্দ্দিকে তীর বৃষ্টি চলেছে! সামুগড়ের প্রান্তরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন—সেখানেও বিজয়ী শত্রুদলের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকের অভাব হ'ল না। যখন আওরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করছিলেন—মীরজুমলা চিৎকার করে উঠল—“হস্তীপৃষ্ঠে অপেক্ষা করুন।” আওরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন না। সামুগড় আওরঙ্গজেবকে সিংহাসনের পথে চলা শিক্ষা দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক শুজাকে পরামর্শ দিল—হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করুন, যদিও দারার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুজা অবগত ছিলেন। তবু ভাগ্যহীন শুজা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হল। সৈন্যদল

পলায়ন আরম্ভ করল   জয়ের চরম মুহূর্ত্তে শুজা আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হলেন।

আমার লেখনী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই কয়েকটি ঘটনা শাহ-জাহানের সাম্রাজ্যের ভিত্তি চিরতরে শিথিল করে দিয়ে গেল, পিতা শাহজাহান পুত্রদের বিশ্বাস করতেন—সেই পিতা-পুত্রের সংগ্রামের ধ্বনি হ'ল, ইয়া তক্‌ত ইয়া তাবুত, "হয় সিংহাসন না হয় সমাধি।" শাহ শুজার ভাগ্যে সমাধিলাভও হয় নি। আশ্রয়ের জন্যে শাহ শুজা ব্রহ্মদেশে পলায়ন করেছিলেন, সেখানে রাজা তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে বনে নিয়ে গেল। রাজার অনুচরের ছুরিকাঘাতে শুজাকে হত্যা করা হ'ল। তাঁর মৃতদেহ বন্যজন্তুর আহার্য্যে পরিণত হয়েছিল। রাজপুত্র শুজাই প্রথম সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন। কর্ম্মফল? না, অদৃষ্ট?

* * * * *

* * * * *

দশম স্তবক

খাজুয়াতে শুজার পতনের পর আবার আরম্ভ হ'ল দারার কাহিনী। এখানে আমার কাহিনী আমার প্রারম্ভ দিনে এসেছে।

*　　　*　　　*　　　*

সেদিন ছিল এক হাজার উনসত্তর হিজরী জমাদিউল-আওয়াল (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)। দারা পূর্ব্বব্যবস্থামত যশোবন্ত সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আগ্রার পথে মিলিত হওয়ার জন্যে তাঁর নূতন সৈন্য নিয়ে গুজরাট থেকে অভিযান আরম্ভ করলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের সাহায্য ব্যতিরেকে শাহজাদা দারার পক্ষে আওরঙ্গজেবকে প্রতিহত করার বা সিংহাসন উদ্ধার করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমার পিতার বিশ্বস্ত সামন্ত যশোবন্ত সিংহও প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করেন নি। আওরঙ্গজেবের ইন্দ্রজালে, চক্রজালে বা অর্থজালে ধরা পড়ে নি এমন ত কেউ ছিল না।

দারা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় আজমীরের অদূরে শিবির সংস্থাপন করলেন এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটি পরিখা খনন করলেন। আওরঙ্গজেব উপস্থিত হয়ে দেখলেন আক্রমণ অসম্ভব। আওরঙ্গজেব নূতন সূত্র অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত বিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত দিলওয়ার খান পূর্ব্বেই ধর্ম্মের নামে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব দিলওয়ার খানকে দিয়ে দারার নিকট পত্র লিখ্লেন—সে পত্রে লিখিত ছিল, "আমি কোরাণ স্পর্শ করে বল্‌ছি যে যুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করে শাহজাদার সঙ্গে যোগ দেব।" সুতরাং দারা সেই পত্রে বিশ্বাস করে তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন তারা যেন দিলওয়ার খানের সৈন্যদের আক্রমণ না করে।

যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আওরঙ্গজেবের জ্যোতির্ষী ভবিষ্যদ্বাণী করল যে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলীর দুর্ভাগ্য সূচনা

করছে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁদের গোপন মন্ত্রণা সভায় এই সংবাদ শুনে শেখ মীর সম্রাটের হস্তী আরোহণ করে সম্রাটের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রত্যূষের প্রথম প্রহরে সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রা করেছে। শেখ মীর আওরঙ্গজেবের হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন, আওরঙ্গজেবের ভূষণ-পরিহিত। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে সৈন্যগণ নিশ্চিত ছিল যে, তাদের অধিনায়ক স্বয়ং পুরোভাগে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। দারার গোলন্দাজবাহিনী শত্রুকে বিক্ষিপ্ত করছিল। শেখ মীর গুলীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। কিন্তু তাঁর শরীররক্ষী মৃতদেহ যথাস্থানে নিবদ্ধ করে সৈন্যদের উৎসাহিত করছিল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ অধিনায়ককে জীবিত মনে করে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল।

আওরঙ্গজেব এবারও তাঁর হস্তীপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন নি।······

এবার দিলওয়ার খানের সুযোগ উপস্থিত। তিনি দারাকে ইঙ্গিত করলেন যেন তাঁর সৈন্যদের অতিক্রম করতে দেওয়া হয়। তারপর তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন। কিন্তু দারার পক্ষে যোগ না দিয়ে দারার সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। দারার সমস্ত সৈন্য পলায়ন করল। সুতরাং দারা দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেন।

হতভাগ্য দারার দুর্ভাগ্য আরও ঘনিয়ে এল। গুজরাটের যে নগর থেকে দারা শুকো অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, সেই নগর নিজের গৃহ মনে করে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। কিন্তু সেই নগরে তৃষ্ণার্ত্ত ধূলিধূসরিত দারার প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে দারার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল। শিবির হতে উত্থিত নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ করে দিল। সে কণ্ঠস্বরে ছিল বিধাতার করুণা যাচ্ঞা!

কেন, কেন ভগবান মানুষের সত্তাকে অবনমিত করেন? অথচ সেই আত্মাকে আবার ভগবান নিজের কাছে টেনে নেন। শাহজাদা দারার পুরাতন বন্ধুগণ তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন; তাঁর পরাজয়ের পরেও যে

সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ আজ তাঁকে ত্যাগ করে গেছে। আজ দারা তাঁর হীনতম অনুচরের সঙ্গেও আলাপ করলেন,—তিনি যে আজ পৃথিবীতে রিক্ততম।

আওরঙ্গজেবের অনুচর কর্ত্তৃক অনুধাবিত হয়ে দারা পারস্যের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর তিন স্ত্রী—নাদিরা বেগম, উদীপুরী বেগম, রাণাদিল, কন্যা জানি বেগম এবং কনিষ্ঠ পুত্র শিপার শুকো। দুই সহস্র অনুচর তখনও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে নি।

কেন দারা বিশ্রাম না করে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে যান নি? এবার অদৃষ্ট তাঁর সম্মুখে সর্ব্বশেষ বাধা সৃষ্টি করল। তাঁকে দুঃখের গভীরতম গহ্বরে টেনে নিল। পারস্য সীমান্তের অনতিদূরে অতি ক্ষুদ্র ধুণরাজ্য অবস্থিত ছিল। সে রাজ্যের আফগান রাজাকে দারা অতীতে তিনবার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে ধুণরাজ্য পরিদর্শনের ইচ্ছা করলেন। আফগান রাজা তাঁকে সাহায্য না করে সপরিবারে কারারুদ্ধ করল এবং সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন করল। দারার খোজা ভৃত্য আফগান সুলতানকে হত্যা করে তার প্রভুকে রক্ষা করবার সংকল্প করল। কিন্তু তার বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হয়ে গেল। দারার সমস্ত সৈন্য কারারুদ্ধ হ'ল। সংবাদ রটে গেল যে, আওরঙ্গজেবের সৈন্য ধুণরাজ্য থেকে বেশী দূরে নয়।

দারার প্রধানা স্ত্রী নাদিরা বেগম ভয়ার্ত্তা, কম্পিতা, নিরাশাহতা হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সুতরাং তিনি স্বামীর অবর্ত্তমানে জীবনধারণের ইচ্ছা পরে ত্যাগ করলেন। আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচারিণী-রূপে নিজেকে কল্পনা করে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "প্রতিহিংসাপিপাসু আওরঙ্গজেব আমার স্বামী-পুত্রের রক্তে তাঁর রক্তপিপাসা নিবারণ করবেন। সেই অত্যাচারীর জয়যাত্রার পথে আমার মৃত্যু হবে তার জয়চিহ্ন।"

শাহজাদা দারা ১৭৩ পৃঃ

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর অঙ্গুরীর বিষ লেহন করলেন ; মুহূর্ত্তে তাঁর মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত। এমন দুর্ভাগ্য আর দারার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নি। নাদিরা বেগম ছিলেন নারী-কুলমণি।

মৃত্যু-শিবিরে তখনও ক্রন্দনলিপি শেষ হয় নি, অস্ত্রের ঝনঝনা বেজে উঠ্‌ল দুর্গদ্বারে। আওরঙ্গজেবের অনুচর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, "বন্দী কর।" সেই স্বর ধুণরাজ্যের সমস্ত দুর্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। দারা তরবারি উত্তোলন করলেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পত্নীর পার্শ্বে সংগ্রাম করে নিহত হবেন। কিন্তু শত্রুগণ তাঁকে বন্দী করল ; তাঁর হস্তপদ শৃঙ্খলিত করল। তাঁর অন্য দুই স্ত্রী, সন্তানগণ এবং ক্রীতদাসীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য চারিটি হস্তী দুর্গদ্বারে নীত হ'ল। একাকী দারা যে হস্তীতে আরোহণ করলেন, তাঁর সন্ধান গোপন রাখা হ'ল। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে উন্মুক্ত বর্শা ও তরবারি নিয়ে ঘাতক উপবিষ্ট ছিল। সেই বন্দীর শোভাযাত্রা ভাক্কার দুর্গের দিকে অগ্রসর হ'ল। ভাক্কার দুর্গরক্ষিগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল, উৎকোচ গ্রহণে তারা বশ্যতা স্বীকার করে নি, আক্রমণেও তারা পরাভূত হয় নি। তারা দারার আদেশ ভিন্ন অন্য কোন মানুষের আদেশ পালন করলে না। দারার প্রতি এই দুর্গবাসীর বিশ্বাস কত গভীর ছিল যে, বন্দী দারাকেও বাধ্য হয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর নিকট দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করতে হ'ল।

চল্লিশ দিন পরে বন্দিগণ দিল্লীতে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত পথ তারা বহু অশ্বারোহী সৈন্য পরিবৃত হয়ে এসেছিল। দাদার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে উজ্জ্বল বর্ম্ম-পরিবৃত কয়েকটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রহরী নিযুক্ত হয়েছিল। এইবার আমার জীবন কাহিনী আরম্ভের দিন এসেছে।

* * * *

একটি উন্মুক্ত হাওদায় হস্তীপৃষ্ঠে শাহজাদা বুলন্দ্‌ইক্‌বাল দারা শুকো। মানুষের করুণ দৃষ্টির সম্মুখে দিল্লীর রাজপথে একদা বিশ্রুত শক্তিমান দারা শুকো এই অপমানহত অবস্থায় চলেছে। একজন ফকির চীৎকার করে উঠল—"শাহজাদা দারা যখন তুমি স্বাধীন ছিলে, তুমি প্রত্যহ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছ, আজ তোমার দেওয়ার মত কিছু নেই জানি ;" তবু সম্রাট্‌-পুত্র তাঁর ছিন্ন গাত্রাবরণ শাল ফকিরকে দান করলেন। ইহলোকে তাঁর সর্ব্বশেষ দান অর্পণ করার লোভ সম্বরণ করতে তিনি পারেন নি! কিন্তু আওরঙ্গজেব দান সম্পন্ন করতে দেননি, কারণ বন্দীর দানের অধিকার নেই।

দারার বিচার শেষ হ'ল। "মুর্ত্তিপুজা, ইস্‌লামের শত্রু এই অপরাধে"—তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে। আওরঙ্গজেবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাঁকে ভীত করেছিল। ঘাতকের আঘাতের পুর্ব্বে দারা চীৎকার করে বলেছিলেন, "মহম্মদ আমার প্রাণ হরণ করেছে, ঈশ্বরের পুত্র আমাকে জীবন দান করেছে।" (৭৫)।

মানুষ যত, ঈশ্বরের পথ তত। দারা বহু পথে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর লাভ করেছেন কি? মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল—জগতের সনাতন নিয়ম কোন মানুষ অতিক্রম করে যেতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি বন্ধন আছে, যা' কোন ভাষা পুর্ণ প্রকাশ করতে পারে না।

দারা! পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌ তোমার করুণা বর্ষণ করুন।

দারার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দুই স্ত্রী ও পুত্রগণ তখনও জীবিত। আওরঙ্গজেব স্বয়ং সেই দণ্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন, তারপর শাহজাহানের নিকট কারাগারে সেই মুণ্ড প্রেরণ করেছেন।

* * * *

---

(৭৫) মহম্মদ মরা জান্ মি কুশাদ,
ইবন্ আল্লাহ্ মরা জান্ মি বক্‌শাদ।

আওরঙ্গজেব উদীপুরী বেগমকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। সে ছিল জর্জ্জিয়া দেশের খৃষ্টীয়ান কন্যা। উদীপুরী আওরঙ্গজেবের আদেশ পালন করল। আওরঙ্গজেব তাঁকে বিবাহ করলেন। কিন্তু রাণাদিল্ নীচজাতীয়া নর্ত্তকী ভারতবর্ষের কন্যা; পত্রোত্তরে আওরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসা করল, "জাঁহাপনা কেন আমাকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেছেন?" সম্রাট উত্তরে লিখলেন যে, তিনি রাণাদিল্‌কে বিবাহ করতে চান। রাণাদিল্ লিখল—"আমার মধ্যে এমন কি আছে যা' সম্রাটকে সন্তুষ্ট করতে পারে?" সম্রাট উত্তর দিলেন, "তোমার ঘন কৃষ্ণ কেশদাম আমাকে মুগ্ধ করেছে।" তৎক্ষণাৎ রাণাদিল্ তার কুন্তলদাম কর্ত্তন করে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করে পত্র লিখল—জাঁহাপনা, এই সেই সুন্দর কেশদাম, এই ত' আপনি পেতে চেয়েছিলেন। আমি শান্তিতে জীবন যাপন করতে চাই।"

আবার আওরঙ্গজেব লিখলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। কারণ তোমার রূপ অতুলনীয়। আমি তোমাকে আমার অন্যতম সম্রাজ্ঞী বলেই মনে করব। তুমি আমাকে শাহজাদা দারা বলেই কল্পনা কর···।"

রাণাদিল্ একখানি ছুরিকাঘাতে তার সুন্দর মুখ ক্ষত বিক্ষত করে দিল। তারপর একখণ্ড বস্ত্র রক্ত-লিপ্ত করে আওরঙ্গজেবের নিকট পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একখানি পত্রে সে লিখল, "সম্রাট যদি আমার সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে সে সৌন্দর্য্য আর নেই। যদি সম্রাট আমার রক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে রক্তাম্বুলিপ্ত বস্ত্রে আমার রক্তচিহ্ন দেখতে পাবেন। আমি আমার সমস্ত রক্ত পাত করতে প্রস্তুত যদি রক্ত আপনার তৃপ্তি সাধন করে।"

আওরঙ্গজেব রাণাদিলের দৃঢ়চিত্ততার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিছুকাল শোকাবহ জীবন যাপন করে রাণাদিল্ মৃত্যুর

অপর পারে তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হ'ল। কারণ রাণাদিল্ ছিল ভারতবর্ষের দুহিতা, হিন্দু কন্যা।

দারার কন্যা রূপসী জানি বেগমকে আমার ভগ্নী রোশনআরার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। রোশনআরা দারার মৃত্যুর পর বিজয়িনীর গৌরবে এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিল। রোশনআরা এই পিতৃমাতৃহীন বালিকার প্রতি অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করেছিলেন। জানি বেগম প্রতিদিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তারপর একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে আগ্রার দুর্গে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন ছিল আমার এক আনন্দের দিন। সেদিন আঙ্গুরীবাগের উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা আমায় অতীত আনন্দের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। বিহগকুল বহুদিন-বিস্মৃত সুর জাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন পর্য্যন্ত মুঘল রাজবংশ অগ্রজ ভ্রাতাদের একটি বংশধরও জীবিত থাকবে ততদিন আওরঙ্গজেবের স্বস্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত মুঘল বংশধর বন্দী হ'ল এবং গোয়ালিয়র দুর্গে তাদের হত্যা করা হ'ল। এই গোয়ালিয়র দুর্গে আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান মহম্মদকেও "পপীর" সরবৎ পান করান হয়েছিল, কারণ তার ছিল আত্মসম্মান বোধ।

সুতরাং কোরাণের নির্দ্দেশ—কোন মানুষকেই বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ঘোষণা করা হ'ল—মুরাদ একদা এক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। অভিযোগকারী উপস্থিত হ'ল। মুরাদ হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুরাদের দোষ অনুসন্ধান করা ও প্রমাণ করা আওরঙ্গজেবের প্রয়োজন ছিল।

পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে বহু কষ্ট ভোগের পরে সুলেমান শুকো বিশ্বাস-ঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়ে আওরঙ্গজেবের সম্মুখে আনীত হলেন। এই সুগঠিত সুঠাম তরুণ যোদ্ধা যখন পিতৃহন্তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন রাজদরবারে একটা অস্ফুট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্তঃপুরে

অবগুণ্ঠনের মধ্যে বহু অশ্রুপাত হয়েছিল। সুলেমান এবং সম্রাটের একই রক্ত। তাকে কি হত্যা করার পূর্ব্বে 'পপীর' সরবৎ পানের অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যেত না ?

এই বীরপুরুষ প্রার্থনা করেছিলেন, "চাচা! আমাকে হত্যা করো, কিন্তু আমাকে 'পপীর' সরবৎ পান করতে দিও না, তোমার কাছে একটুকু অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।" আওরঙ্গজেব কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—"তোমাকে 'পপীর' বিষ দেব না।" কিন্তু প্রথম দিনই গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমান শুকোকে পানপাত্রে 'পপীর' বিষাক্ত সরবৎ দেওয়া হয়েছিল। একমাস পরে তাকে হত্যা করা হয়।

* * * *

কে যেন আগ্রার উপর দিয়ে তীব্র উষ্ণ বায়ু শব-আচ্ছাদন বস্ত্রের মতন বিছিয়ে দিয়েছে। আমি কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্য কতবার আকাঙ্ক্ষা করেছি! সেখানে দেবদারু বৃক্ষ বনের রক্ষীর মত পর্ব্বত শিখরে দণ্ডায়মান। হরিদ্রাভ রক্তমুখী ওপেল বর্ণের বন-পুষ্পরাশি সমস্ত বনে ছড়িয়ে রয়েছে। সে বন কখনও মানুষের রক্ত পদক্ষেপে দলিত হয়নি। আমি যদি সেখানে জাফরাণ ও গোলাপ-বীথি অতিক্রম করে পল্লবাকীর্ণ বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে একটি সরোবর তীর স্পর্শ করে পর্ব্বত হতে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ করতে পারতাম। পর্ব্বত যেন কোন বিরাট রহস্যকে গোপন করবার জন্য আকাশের প্রচ্ছদপটে এক বিরাট অর্গল রচনা করেছে। একটি মৃদুমন্দ বায়ু শুভ্র তুষারের দেশ থেকে ভেসে এসে পর্ব্বতের উপরে চিন্তার আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের দেশে আমাকে নিয়ে যাবে।

আমার বিনিদ্র রজনীতে আমি কতবার জাগ্রত-স্বপ্নের মধ্যে ফতেপুর শিক্রীতে বেড়িয়ে এসেছি। আজ ফতেপুর শিক্রী সবচেয়ে বেশী পরিত্যক্ত—কিন্তু আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে ফতেপুর শিক্রীর

গৌরবময় অংশগুলি। সম্রাট আকবরের স্বপ্নপুরী ফতেপুর শিক্‌রী আর কখনও তৈমুর বংশের অধিকারে জীবনের স্পন্দন অনুভব করবে না! পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর স্তম্ভে ধ্বংসের দেবতা শিব কখনও আসন পরিগ্রহ করেন না। বোধ হয় এমন একদিন আসবে যখন ভারতমাতার সন্তান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করবে এবং সেই নরপতি মন্দিরের দ্বারে আপনার যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করে মন্দিরে প্রবেশ করবে। সেই মহা-নরেশ উপলব্ধি করবে……"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

* * * * *

* * * *

* * *

* *
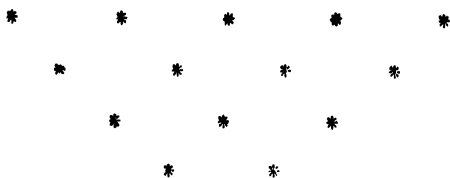
একাদশ স্তবক

[পাণ্ডুলিপির অংশগুলি ছিন্ন ভিন্ন ও অসংলগ্ন, কোথাও বা সামান্ত ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র। পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একত্র গ্রথিত ছিল না। মাঝে অনেকগুলি পাতা নাই। বোধহয় জাহানারা তাঁর জীবন কাহিনী নষ্ট করতে ইচ্ছা করেছিলেন এবং কিছুটা ধ্বংসও করেছিলেন, পরে হয়ত মত পরিবর্ত্তন করেন এবং অসংলগ্ন পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির পার্শ্বে রেখে দেন।]

* * * *

আমার যদি ঘৃণা করার শক্তি থাকত তবে সে ঘৃণা আওরঙ্গজেবের প্রাণহরণ করা পর্য্যন্ত শান্ত হ'ত না—আওরঙ্গজেব যে বহু নিরপরাধের প্রাণ হরণ করেছিলেন! ওঃ, তিনি যে তাঁর পিতার প্রাণ হরণ করতে চেয়েছিলেন!

একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর নাসীরউদ্দীন খলজীর কবরে পদাঘাত করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন, "শতাব্দীর ব্যবধানে এই পিতৃহন্তার শবদেহের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সমস্ত খনন কর এবং নদীর জলে নিক্ষেপ কর, কারণ সে তার পিতা মুবারক খলজীকে পদাঘাতে হত্যা করেছিল।"

যে মানুষ প্রতিহিংসার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, তার জীবন বিষময়। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করতে শিখিয়ে দাও। আমার মন থেকে প্রতিহিংসার প্রেরণা দূর করে দাও।

সব নিঃশেষ হয়ে গেছে; আলো নিভে গেছে; ভোজের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে; আমি একাকিনী চলেছি। সঙ্গী আমার নেই, আমি যে রিক্তা।

আমার বাহিরে শূন্য, আমার অন্তরেও বিরাট রিক্ততা। এই সমস্ত জগতে শূন্যতা ভিন্ন আর কি আছে? আমার মনে পড়ে আমার

সহোদরগণ শৈশবে পুতুল-সৈন্য নিয়ে খেলা করতেন। একদিন খেলার সময় সামান্য আঘাতে তাদের পুতুলগুলি ভূপতিত হয়ে গেল, কিন্তু কয়েকটি পুতুল সৈন্য তখনও দাঁড়িয়েছিল। কেউ পড়ে গেল, কেউ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সে যে পুতুল খেলা!

আমাদের মধ্যে যারা পড়ে গেছে আর যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ সব কি ভগবানের হাতে খেলার পুতুল নয়?

আমার জীবন—একটি ভগ্ন মুকুট। কিন্তু সেই মুকুটের প্রতিটি বিক্ষিপ্ত অংশ পরিপূর্ণ।

······আনন্দ? সে ত' প্রাচীর গাত্রে প্রতিফলিত অস্ত-সূর্য্যের রশ্মি মাত্র! নয় কি?

প্রত্যেক মসজিদই একটি কারাগার, প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ একটি কারাগৃহ। যারা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথে চলে বেড়ায়—তারাই পৃথিবী জয় করে।

আমার জীবন বর্ষা-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ একটি বৃক্ষপত্র মাত্র, অবশিষ্ট রয়েছে কয়েকটি তন্তু। আজও স্বর্গের নীলিমা সেই তন্তুর মধ্য দিয়ে আলো স্ফুরিত করতে পারে কি?

সম্রাট আলমগীর পঞ্চপুত্রের পিতা। আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্রের ভয়ে কম্পমান। সুলতান মহম্মদ ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ। যে মানুষ একদা যুদ্ধরত সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেন নি—আজ তাঁর মেরুদণ্ড শাস্তির ভয়ে ক্রীতদাসের মত অবনমিত হয়ে পড়েছে।

*　　*　　*　　*

একদিন আমি মীরাবাঈ-এর উদ্দেশ্যে রচিত তানসেনের একটি গান শুনে জেগে উঠেছিলাম। কোয়েল আঙ্গুরীবাগ থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল আমায় উপহার দিয়েছিল, সেদিন ছিল আমার শাস্তির

মুহূর্ত। হাজীর এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, আওরঙ্গজেব বুন্দীরাজ ছত্রশালের পুত্র রাও ভাওকে মার্জ্জনা করেছেন। মৃত পিতার প্রতি ঘৃণাপ্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেব রাও ভাওকে বহু শাস্তি দিয়েছিলেন। আজ পুণ্যকীর্ত্তি ছত্রশালের পুত্র রাও ভাও আওরঙ্গবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন। আমি কখনও সে কথা ভুলব না! আমি ভুলতে পারব না এই অপমান! এ যে মান দিয়ে অপমান।

* * * *

আওরঙ্গজেব অন্ততঃ একজনকে ভালবেসেছিলেন; আমি সেকথা জানি। একদা জৈনাবাদীর মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন। জৈনাবাদী প্রেমের খেলা করে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেবের হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে প্রবেশ করেছিল। জৈনাবাদী প্রেমের জন্য আওরঙ্গজেবের স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেমের ছলে তাঁকে সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। জৈনাবাদীর প্রেমে আওরঙ্গজেব অন্ততঃ কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বজগৎ ভুলে যেতে পারতেন। আমি প্রেমময়ী জৈনাবাদীকে চিরকাল স্মরণ করব।

* * * *

পিতা অসুস্থ—একদিন পিতার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি আমার হস্তীগুলি এখনও দান করতে পারছি না। আমি আমার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে পারছি না; কারণ তারা হয়ত সম্রাটকে রোগমুক্ত করতে পারে। (৭৬) আমি কিন্তু পিতার রোগমুক্তি চাই না। এক্ষণে আমি মৃত্যুকে তাঁর আত্মার মুক্তিদাতা বলে আমন্ত্রণ করছি।

আমার সহোদর ভ্রাতা আওরঙ্গজেব প্রায়ই পিতার কাছে পত্র লিখিতেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে প্রজাবর্গ তাঁকে কঠোরচিত্ত বলে

(৭৬) মুসলমানের ধারণা আছে, রোগীর কল্যাণে জীব-বলি বা দান অথবা দাস-দাসীদের মুক্তি দিলে রোগ নিরাময় হয়।

আখ্যায়িত করে। বৃদ্ধ সম্রাট অনেক কিছুই ভুলতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি কখনই আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কারণ, দারার রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড একদা তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিল, তা' তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। তারপর সেই মুণ্ড দুর্গের বিপরীত দিকে তাজমহলে প্রোথিত করা হয়েছে—সেই তিক্ত স্মৃতি আজও শাহজাহান ভুলতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট তাঁকে মুকুটমণির সন্ধান দেননি।

এখন আমার মনে আসছে একদিন ফতেপুর শিকৃরীতে ভারতের বুকে তৈমুর বংশধরগণের রক্ত-পদচিহ্ন রেখার বিষয় চিন্তা করেছিলাম। সেই পদচিহ্ন আজ আরও কত বেশী রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহম্মদ তুঘলক্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর নৃশংস কার্য্যের দ্বারা প্রজার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ তুঘলকের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের কথা ভেবে ফিরুজ শাহ মহম্মদ তুঘলকের নির্য্যাতিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তাদের দ্বারা একটি মার্জ্জনা পত্র লিখিয়েছিলেন। সেই পত্র তিনি মক্কায় মহম্মদের সমাধি মন্দিরের গম্বুজের পার্শ্বে রেখে দিয়েছিলেন। শেষ বিচারের দিনে অত্যাচারীদের মার্জ্জনাপত্র হয়ত আল্লাহ্‌র ক্ষমা যাচ্ঞা করবে। পত্রখানি এখনও সেখানে রক্ষিত আছে। (৭৭)

* * * *

আমি যদি কখনও কারামুক্ত হই এবং আওরঙ্গজেব যদি কখনও

---

(৭৭) তৈমুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে মহম্মদের বংশধর আল্‌বরোকীকে তাঁর সঙ্গে কবর দিতে আদেশ করেন, কারণ শেষ বিচারের দিনে আল্‌বরোকী মহম্মদের নিকট তৈমুরের মঙ্গলের জন্য যাচ্ঞা করবেন। সত্যই আল্‌বরোকীকে তৈমুরের সঙ্গে কবর দিয়ে একসঙ্গে বস্ত্র দ্বারা বেঁধে দিয়েছিল।

আমার উপদেশ চান, তাহলে আমি তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উপদেশ দেব। তাঁর নির্য্যাতিত শত্রুর মধ্যে অনেকেই আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় ছিল। তাদের হয়ে আমি আওরঙ্গজেবকে বলব, "রাজ্যলাভের আশায় আর রক্তপাত করো না। দানবের দুর্গ মনে করে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করো না। বিজয়ী ইসলাম স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠুক জ্ঞানের আলোকে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় শকট পরিচালিত করো না।"

আমি তাঁকে আনন্দে একটি জিনিষ দান করতাম, সেই জিনিষের শক্তি তাঁকে বিভীষিকার রাজ্য অতিক্রম করবার শক্তি দিত। যদি এই সম্রাটের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকার হ'ত, তবে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অদম্য অধ্যবসায়ী রাজকুমার কত মহৎ হতে পারতেন! আমি তাঁর অন্তরে দেখতে পাচ্ছি শুদ্ধ সত্ত্বার অস্পষ্ট ছায়া। নীরব গভীর অনুতাপের ক্ষীণ আলোক রেখা এবং সেই ক্ষীণ আলোকের উপর নির্ভর করে তাঁর হৃদয়ে ভগ্নী-প্রীতি সঞ্চারিত করব।

* * * *

আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। একটি আলোকশিখা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই আলোকশিখা অশৃশুলোকে আবার জ্বলে উঠবে। পিতার দেহ নিয়ে গেছে সেই শ্বেতমর্ম্মর প্রাসাদে যেখানে আমার মাতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সমাধিতে দু'জনের জন্য আলো জ্বলে উঠবে, দু'জনের জন্যই কোরাণ আবৃত্তি করা হবে।

* * * *

আমি আমার আত্মজীবনী নষ্ট করব! না, না, কেন নষ্ট করব? এই আত্মজীবনী আমার রুদ্ধকারার দিনগুলির সখা। এ যে আমার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা, এতে যে আমার দুলেরার স্মৃতি জড়িত রয়েছে, এর প্রত্যেকটি শব্দ যে আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি; আমি আজ সম্রাট

বাবরের কথাগুলি স্মরণ করছি, "আমার আপন আত্মার মত বিশ্বস্ত কোন বন্ধু আমি পাইনি। আমার নিজ অন্তর ব্যতীত আমি কোন নির্ভরযোগ্য স্থান পাইনি।" আমি জেস্‌মিন প্রাসাদের শিলাতলে গচ্ছিত রেখে যাব এই ছত্রগুলি। বোধহয় সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন জেস্‌মিন প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আমার এই আত্মজীবনী পাথরের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে মানবের অক্ষিগোচর হবে। মানুষ জানবে—সম্রাট শাহজাহানের কন্যার মতন দীনা রিক্তা কেহই ছিল না।

*   *   *   *

তাজমহল গমনের পথে আওরঙ্গজেব যে মসজিদে প্রার্থনা করেছিলেন, তাকে আমি মূল্যবান ঝালর ও গালিচা দিয়ে শোভিত করেছি। আমি দুর্গের অভ্যন্তরে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমি সঙ্গে নিয়ে যাব তাঁর জন্য মণিমুক্তায় পূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র; সে তাঁর বহুদিনের বাঞ্ছিত ধন। আরও সঙ্গে নেব ক্ষমা—যে ক্ষমা তিনি বহুবার পিতার নিকট যাচ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু পিতা তাঁকে সে ক্ষমা দেননি। আমি পিতার হয়ে তাঁকে ক্ষমা করব। আমি তাঁর কাছে একখানি পত্র লিখেছি। সে পত্রে আমার মুমূর্ষু পিতার পুত্রের নিকট শেষ ইচ্ছার কথা আমার ভাষায় আমি লিখেছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্নেহের পিতা তাঁর পুত্রকে একবার দেখবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

মৃত্যুর পর শাহজাহানের মৃতদেহ দুর্গের পশ্চাৎদিকে প্রাচীর ভা[illegible] করে দ্বার উদ্ঘাটন করে দিনের আলোর পূর্ব্বেই বিনা সমারোহে নি[illegible] গেছে। আওরঙ্গজেবের ভয় ছিল যদি প্রজাকুল তাদের স্নেহময় সম্রাটে[illegible] মৃতদেহ দর্শনে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। আওরঙ্গজেব সদা শঙ্কি[illegible] কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করব।

আমি পুষ্পের নির্য্যাস দিয়ে আমার কেশদাম সিক্ত করে নেব। আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যূথির স্নেহ দিয়ে অনুলেপন করে নেব। তারপর আমি একখণ্ড শুভ্র শাড়ী পরিধান করে আমার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সেদিন হবে ভ্রাতা-ভগ্নীর পুণ্য মিলনের পুণ্য দিবস। মনে পড়েছে। গোয়ালিয়র দুর্গে আমার পিতার বংশধরদের মস্তিষ্কের শক্তি বিলোপ করবার জন্য আওরঙ্গজেব পানপাত্রে বিষ মিশ্রিত করেছিলেন। আমিও কিন্তু তাঁকে একটি পানপাত্র দেব। সে পানপাত্রে বিষ থাকবে না—থাকবে ঘৃণা ও বাসনা বিনষ্ট করবার অমৃতধারা। সে পানপাত্র থেকে যে ধারা নিঃসৃত হবে তার নাম হবে **"দুঃখ"**। আওরঙ্গজেব! আমার দিক থেকে তোমার আর ভয়ের কোন হেতু নেই।

কোন বিষপানে আমাকে হত্যা করতে পারবে না। অযথা আমি বিষপানে আত্মহত্যা করব না। আমার চারিপার্শ্বে অখণ্ড নীরবতার রাজত্ব রচিত হবে। আমি বিতরণ করব শান্তি, যে শান্তি মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধিতে আজও মর্ম্মর সৌধের পার্শ্বে গোলাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

শারদোৎসবে ভারত ললনা দেবতার অর্ঘ্যরূপে নদীর জলস্রোতে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়—আমিও কালের নদীতে দিব্যশক্তির স্রোতে ভাসিয়ে দেব আমার অন্তরের আলোকশিখা।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস [illegible] [illegible]ত্তা—৬

গ্রন্থকারের রচনাবলি

১। মিশরের ডায়েরী (৩ খণ্ড)
২। হে অতীত কথা কও
৩। আরব শিশুর গল্প
৪। শরৎ সাহিত্যে পতিতা
৫। বাংলার মনীষী (৫ম সংস্করণ)
৬। দেশ-বিদেশের ছেলে-মেয়ে (৪র্থ সংস্করণ)
৭। বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলি
৮। জাহানারার আত্মকাহিনী (৩য় সংস্করণ)
৯। ভারতবর্ষ পরিচয় (৩য় সংস্করণ)
১০। ছেলেদের সমগ্র বঙ্কিমচন্দ্র (যন্ত্রস্থ)
১১। আরব সাহিত্যে সংস্কৃতের দান
১২। Din-i-Ilahi (আকবরের ধর্ম্ম) (2nd. Edition)
১৩। Egypt in 1945
১৪। State and Religion in Mughal India
১৫। Music in Islam (under print)
১৬। Gita in Arabic Translation with notes & Introduction (under print)